উইমেন রিসোর্স
নেটওয়ার্ক

পার্বত্য অঞ্চলের নারীর অধিকার প্রসঙ্গে

নারীর প্রতি সহিংসতা
প্রতিরোধে চাই
সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর
পরিবর্তন

পার্বত্য অঞ্চলের নারীর অধিকার প্রসঙ্গে

উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম।
২০১৯

পার্বত্য অঞ্চলের নারীর অধিকার প্রসঙ্গে

প্রকাশ কাল
ডিসেম্বর, ২০১৯ইং

সম্পাদনা পরিষদ
মণীষা তালুকদার
এ্যানি চাকমা
উত্তরা ত্রিপুরা
লিসা চাকমা

প্রকাশনায়
উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক
পার্বত্য চট্টগ্রাম।

প্রচ্ছদ ছবি
বাবলু চাকমা

সহযোগিতায়
পার্বত্য চট্টগ্রামের বিকল্প উন্নয়নের জন্য কর্মগবেষণা ও সুশাসনের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি (এআরএডি-সিএইচটি) শীর্ষক প্রকল্প
খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি (কেএমকেএস)
খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি ৪৪০০, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

সংকলন নিয়ে কিছু কথা

উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক সংক্ষেপে "ডব্লিউআরএন" অধিকারকামী পার্বত্য নারীদের একটি নেটওয়ার্ক। পার্বত্য নারীদের অধিকার রক্ষায় নেটওয়ার্কের রয়েছে অনন্য অবদান। বর্তমান সমাজ পুঁজিবাদী মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত। এতে রয়েছে অনেক পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা, বৈষম্যমূলক রীতি-নীতি, প্রথা ও ব্যবস্থা। পার্বত্য অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীর নারীরাও এ সকল ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিনিয়ত নিপীড়িত ও নির্যাতিত হচ্ছে। নারী হওয়ার কারণে লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নারী হওয়ার কারণে জাতিগত বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। দারিদ্র্য বা প্রান্তিকতার কারণেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সমাজে নারীর প্রতি এ সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে মুক্তি প্রয়োজন।

১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তির পর পাহাড়ে কিছুটা শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। সরকারী-বেসরকারী অনেক সংস্থা পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসে। অনেক দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু করে। স্থানীয়ভাবেও গড়ে উঠে অনেক উন্নয়ন সংস্থা। এ সকল সরকারী-বেসরকারী সংস্থা একযোগে অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। কিন্তু পাশাপাশি সমাজের মধ্যে নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা চলমান থাকে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে দেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সভ্য ও উন্নত সমাজ গঠনের জন্য যত দ্রুত সম্ভব নারীর প্রতি সহিংসতা সহ সকল ধরণের সহিংসতা বন্ধ করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটেই ২০০১ সালে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা, ভালবাসা, বন্ধুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়েই জন্ম হয় উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের। এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্যই নেটওয়ার্ক নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে সচেতনতা বৃদ্ধি, সহিংসতায় ভূক্তভোগীদের আইনী সহযোগিতা, সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে নারী প্রতিনিধি নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। বিগত ১৮ বছরের পথ পরিক্রমায় নেটওয়ার্ক পার্বত্য অঞ্চলের নারীদের সমস্যা ও ইস্যুগুলো বির্তকের মধ্যে নিয়ে আসে। এ সকল সমস্যা ও ইস্যু সমাধানে কাজ করে। এখানে অনেক সাফল্য ও ব্যর্থতা রয়েছে।

"পার্বত্য নারী সম্মেলন" পার্বত্য নারীদের অধিকার আদায়ে সংগ্রামের নেটওয়ার্কের একটি অনন্য কর্মসূচী। ২০০১ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত মোট ১০টি সম্মেলন আয়োজ নকরেছে। সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, পার্বত্য নারীদের বর্তমান অবস্থা এবং আশু করণীয় বিবেচনা করে নেটওয়ার্কের প্রতিটি সম্মেলনের জন্য একটি প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়কে চিহ্নিত করে। নেটওয়ার্ক এ প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে পার্বত্য নারীদের সমসাময়িক অবস্থা বা সমস্যা ও ইস্যুসমূহ মোকাবেলার জন্য করণীয় বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করে।

১০ ডিসেম্বর ২০০৬ সালে ১ম পার্বত্য নারী সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল নেটওয়ার্কের উদ্যোগে ধারাবাহিক আয়োজনের এ কর্মসূচী। ১ম পার্বত্য নারী-সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "পার্বত্য নারীদের জন্য চাই বৈষম্যহীন ও নিরাপদ সমাজ ব্যবস্থা।" সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা পার্বত্য নারীর প্রতি বৈষম্য ও নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। তারা বলেন, নারীরা পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। নারীর গৃহস্থালীর কাজের ভূমিকার মূল্যায়ণ হয় না। নারীরা পরিবারের মধ্যেও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাচ্ছে না। বিবাহ, সন্তান ধারণসহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার কারণে নারীর প্রতি বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ কম বা থাকলেও তা নাম মাত্র। পার্বত্য অঞ্চলের নারীদের সংসদে কোন প্রতিনিধিত্বও নেই। নারীরা ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এ সকল সহিংসতায় ভূক্তভোগীরা ন্যায় বিচার পাচ্ছে না। বিচারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। বিচারের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত ও জাতিগত বিষয়টি সংবেদনশীলতার সহিত বিবেচনা করা হচ্ছে না। পার্বত্য অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী বিচার ব্যবস্থায়ও নারীরা ন্যায় বিচার পাচ্ছে না।

এরই ধারাবাহিকতায় ১২ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে খাগড়াছড়িতে আয়োজন করা হয় ২য় পার্বত্য নারী সম্মেলন। এ সম্মেলনে পার্বত্য নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করার দাবী তুলে ধরা হয়। এখানে বলা হয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকার হলো একটি মানবাধিকার। সংবিধানের ৪২ অনুচ্ছেদে দেশের প্রতিটি নাগরিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভোগ করার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এ অধিকার নিশ্চিত করা সকল নাগরিকের কর্তব্য। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীরা প্রথাগত শাসন ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত। এজন্য পার্বত্য অঞ্চলের প্রথাগত প্রতিষ্ঠান সহ পরিবার ও মাঠ পর্যায়ের সর্বস্তরের সহযোগিতা ও জনসচেতনতা প্রয়োজন।

৩য় ও ৪র্থ পার্বত্য নারী সম্মেলনের (যথাক্রমে ২০০৮ ও ২০০৯ সালে)বিষয় ছিল স্থানীয় ও জনপ্রশাসনে পার্বত্য নারীদের অধিকতর কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। এখানে তিন পার্বত্য জেলায় সংসদ, সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদে সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধির জোর দাবী করা হয়।

প্রথাগত শাসন ব্যবস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য জোর দাবী জানানো হয় ৫ম পার্বত্য নারী সম্মেলনে (২০১১)। এ সময় কার্বারী ও হেডম্যান পদে নারী নিয়োগ দানের জন্য সার্কেল চীফদের প্রতি বিশেষ আবেদন করা হয়। নেটওয়ার্ক এ বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে লবি ও এডভোকেসী করে। ৯ম পার্বত্য নারী সম্মেলনে (২০১৫) পুনরায় 'প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা ও নারীর ন্যায়বিচার' শীর্ষক প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করে বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসে। এখানে তিন পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন জাতিসমূহের নারীর অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সমাজে নারীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার সুপারিশমালা তুলে ধরে।

৬ষ্ঠ পার্বত্য নারী সম্মেলনের (২০১২) প্রধান লক্ষ্য ছিল ক্রমবর্ধমান নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীদের মুক্তি আন্দোলন জোরদার করা। এখানে নেটওয়ার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সদস্য ও সহযোগী সংগঠনদের উজ্জীবিত করার বিশেষ প্রয়াস করা হয়। ৭ম পার্বত্য নারী সম্মেলনে (২০১৩) বলা হয় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। ১০ম পার্বত্য নারী সম্মেলনে (২০১৬) নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য, নিপীড়ন ও সহিংসতা নির্মূলে সমাজে জেন্ডার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে বলে মত দেওয়া হয়। এ জন্য সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে সকল স্তরের প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

তাছাড়া, ৮ম পার্বত্য নারী সম্মেলনে (২০১৪) নেটওয়ার্ক পাবর্ত্য অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান পর্যটন শিল্পের ফলে পাবর্ত্য অঞ্চলের নারীদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে বলে মতামত তুলে ধরে। তাই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবন, সংস্কৃতি ও পরিবেশের সাথে সংবেদনশীল পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার সুপারিশমালা পেশ করা হয়।

এ সকল সম্মেলনে পার্বত্য অঞ্চলে নারীর নেতৃত্ব শক্তিশালীকরণ, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন-নীতি-প্রথার পরিবর্তন, জাতীয়, স্থানীয় ও প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে নারীর যথাযথ অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন, সমাজ গঠনে নারীর অনন্য অবদান, নারীর প্রতি সহিংসতা

ঘটনাগুলোর ন্যায্য বিচার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি উপজীব্য বিষয় নিয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয় যা পরবর্তীতে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলে আমরা মনে করি।

এ সকল সম্মেলনে তৃণমূল পর্যায়ের গৃহিণী, ছাত্র-ছাত্রী, নারী নেত্রী, নারী অধিকার কর্মী, এনজিও কর্মী, শিক্ষক, আইনজীবি, সাংবাদিক, জন প্রতিনিধি, প্রথাগত নেতৃত্ব (কার্বারী, হেডম্যান ও সার্কেল চীফ) সহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, সংসদ সদস্য, সরকারী-বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। তারা নারীর অধিকার ও উন্নয়ন নিয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। জাতীয় পর্যায়ের দেশ বরেণ্য বিশিষ্ট নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে নারী পুরুষের বন্ধুত্বপূর্ণ সমাজ গঠন নিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং পরামর্শ প্রদান করেন। আমাদের আন্দোলনে সমর্থন ও সাহস যোগান। তাদের মতামত, পরামর্শ ও সমর্থনের ফলে আমাদের আন্দোলন আরো গতিশীলতা পায়। তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে পার্বত্য অঞ্চলে নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের কাজে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি এবং এগিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু স্বপ্ন অর্জনের পথ এখনও অনেক দূর। আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। বিগত সময়ের ন্যায় আগামীতেও নারীর অধিকার বিশেষতঃ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আরও সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ দরকার। আমরা মনে করি, এ সংকলনটি আমাদের বিগত সময়ের অনেক সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব-নিকাশ কষে দেবে। বিগত সময়ের আমাদের আহ্বান ও চিন্তাধারা জনমনে অনেক প্রশ্ন ও বির্তকের অবতারণাও করতে পারে। আমরা আশা করি, এ সকল প্রশ্ন ও বির্তক ভবিষ্যৎ ন্যায্য সমাজ গঠনে অনুপ্রেরণা হবে। পাশাপাশি, নারী অধিকার আন্দোলনে অনেক পরামর্শক, সহকর্মী ও সমর্থক যোগাতে সহায়তা করবে। এ সকল কর্মী, সমর্থক ও পরামর্শকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা একটা সচেতন জনতা সৃষ্টিতে সহযোগী হবে। সেই সচেতন জনতার আন্দোলনে নারীর প্রতি সহিংসতা চিরতরে পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত করা সম্ভব হবে এবং আমরা চিরতরে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল ধরণের নারীর প্রতি সহিংসতা বিলুপ্ত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সূচিপত্র

সংকলন নিয়ে কিছু কথা	০৩
পার্বত্য নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা হোক	০৮
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ: প্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৩
আদিবাসী নারীর বিড়ম্বনা: প্রেক্ষাপট পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৮
পার্বত্য নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলন জোরদার করুন	২৭
নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন চাই	৩১
প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা ও নারীর ন্যায় বিচার	৩৭
নারীর প্রতি সহিংসতা নির্মূলে সমাজে জেন্ডার ন্যায্যতা	৪৪

পার্বত্য নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা হোক

(১২ ডিসেম্বর ২০০৭ইং খাগড়াছড়ি পর্যটন মোটেল-এ অনুষ্ঠিতব্য উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক-এর ২য় পার্বত্য নারী সম্মেলনে উপস্থাপিত ধারণাপত্র।)

সম্মানিত সভানেত্রী, সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অতিথিবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংগঠন হতে আগত প্রতিনিধি ও সুধীবৃন্দ, উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের পক্ষ হতে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা নিবেন। দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের দ্বিতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমরা জানি, সারা দেশ এখন দুর্নীতি বিরোধী ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ, বলিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ। এহেন অবস্থায় আমরা মনে করি, পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে আমাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আমরা জানি, নারী সমাজের উন্নয়ন ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নয়ন কোন দিনই সম্ভব নয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের দেশের বাস্তবতা হলো নারীরা প্রতিনিয়ত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ রকম বলিষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকাকালীন সময়ের মধ্যেও বিগত ৩ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে বান্দরবানের লামায় পুলিশ বাহিনীর সদস্য কর্তৃক একজন স্কুল ছাত্রী ধর্ষিত হওয়ার ঘটনা আমাদেরকে হতভম্ব করে। আমরা এ রকম ঘৃণ্য, নৃশংস ও পাশবিক ঘটনাগুলির প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এ ব্যাপারে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমরা সরকারের কাছে আবেদন করছি। আমরা চাই এ ঘটনায় দোষী পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা সহ জড়িত অন্যান্য দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হউক যাতে তারা ভুলে না যায় যে সকলেই আইনের অধীন। আমরা এ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আরও আহ্বান জানাতে চাই যে, এ ধরণের আইন রক্ষাকারী বেশে পাশবিক ও বর্বর নির্যাতনকারীদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যাতে ভবিষ্যতে কোন আইন রক্ষাকারী বাহিনী ভুলেও বে-আইনী কাজ না করেন।

প্রিয় বন্ধুগণ,

উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের পটভূমি বলতে গিয়ে আমার প্রথমেই মনে পড়ে আমাদের সে দিনের মিটিংয়ের কথা। সে দিন ছিল ২৩ নভেম্বর ২০০১ সাল, শুক্রবার। রাঙামাটিতে ছিল কঠিন চীবর দানের উৎসব। এ সময় কিছু নারী উন্নয়ন কর্মী পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীদের অবস্থা আলোচনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। এ সময় তারা উপেক্ষিত, সুবিধা বঞ্চিত, শোষিত ও নির্যাতিত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে কঠিন চীবর দানের ন্যায় আত্মদান করার কথা উপলব্ধি করে এবং এক পর্যায়ে উইমেন্স টাস্কফোর্স গঠন করে। এখান থেকে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের যাত্রা শুরু।

এরপর উইমেন্স টাস্কফোর্সের বেশ কিছু সভা আয়োজন করা হয় এবং কাজের কর্মপরিকল্পনাও করা হয়। বিভিন্ন সভা, অনুষ্ঠান ও কর্মশালা আয়োজন এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে কিছু সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করা হয়। কিন্তু সাংগঠনিক ও আর্থিক বিভিন্ন অসংগতির কারণে নেটওয়ার্কের কাজ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীতে ০১ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরামের সম্মেলন কক্ষ, রাঙামাটিতে উইমেন্স টাস্কফোর্সের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যরা আরও নতুন উদ্যম ও কর্মক্ষমতা নিয়ে উইমেন্স টাস্কফোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সভায় উইমেন্স টাস্কফোর্সের নাম পরিবর্তন করে "*উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক*" নামকরণ করা হয় এবং সে সময় হতে এ নেটওয়ার্ক নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

নেটওয়ার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:-

১. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কে সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২. উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নেটওয়ার্ক ও সংগঠনসমূহকে সহযোগিতা করা।

৩. আদিবাসী নারীসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এক বা একাধিক প্লাটফর্ম, নেটওয়ার্ক ও সংগঠন গড়ে তোলা। উপরোক্ত উদ্দেশ্যের অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিসোর্স সেন্টার, সেল ও টাস্কফোর্স পরিচালনা করা।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কাঠামোতে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে আদিবাসী নারীসহ পার্বত্য অঞ্চলের নারী সমাজের পূর্ণ ও সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক দু'টি পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত– সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদ। সাধারণ পরিষদ সাধারণ সদস্যদের দ্বারা গঠিত। উল্লেখ্য, নেটওয়ার্কের দুই ধরণের সদস্য আছে– সাধারণ সদস্য ও পর্যবেক্ষক সদস্য। নেটওয়ার্কের সাধারণ সদস্য হতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে কর্মরত প্রতিষ্ঠান হতে হবে। আর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রামে সক্রিয়ভাবে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যবেক্ষক সদস্য হতে পারবেন। বর্তমানে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের কার্যকরী পরিষদ ৭ (সাত) সদস্য নিয়ে গঠিত। খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের সেক্রেটারীয়েটের কাজ করছে। আমাদের সরকারের চলমান সমাজের সর্বস্তরের নারীর ক্ষমতায়নের উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমরা তিন পার্বত্য জেলার নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু কাজ চালিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছি। আমরা বিগত সময়ে নারীদের - জেন্ডার সংবেদনশীলতা, প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও মৌলিক সাংবাদিকতা, নারীর অধিকার, এডভোকেসী ওয়ার্ক সহ অনেক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছি। আমাদের সংগঠনকে আরও জোরদার করার লক্ষ্যে আমরা তিন পার্বত্য জেলায় নারী উন্নয়ন কর্মীদেরকে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অভিজ্ঞতা বিনিময় সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলাপ আলোচনা করেছি। আশা করি এ সকল উদ্যোগ আমাদের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রিয় সুধী,

এটা অনস্বীকার্য যে, আমাদের আরও অন্যান্য সদস্য সংগঠন ও শুভাকাঙ্খীরা বিগত বছরে সরকারী-বেসরকারীভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে আমাদের পার্বত্য অঞ্চলের নারীদের অধিকারের জন্য কাজ করেছে। যার ফলে আমরাও বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছি। তাদের উদ্যোগসমূহকেও আমরা স্বাগত জানাই।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ সকল উদ্যোগ পার্বত্য অঞ্চলের নারীদের স্বপ্ন এক দিন বাস্তবায়িত করতে পারবে।

এটা লক্ষ্যণীয় যে, বিগত সময়ে আমাদের কাজের সাথে আমরা বেশ কিছু সক্রিয় তরুণ কর্মীর অংশগ্রহণ লক্ষ্য করেছি। এটা খুবই উৎসাহজনক। তবে আমাদের

অধিকার অর্জনের জন্য এটা প্রত্যাশানুরূপ নয়। এ জন্য আমাদের আরো কাজ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে-

- আমাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা নারীদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্যমূলক প্রথা, রীতি-নীতি, বিশ্বাস ও ধারণাগুলির পরিবর্তন করাতে হবে।
- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ কম, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নাই বললেই চলে। আমাদের সমাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হেডম্যান, চেয়ারম্যান, কার্বারী ও অন্যান্য মুরুব্বীগণ অধিকাংশই পুরুষ তাই এক্ষেত্রে নারীদের মতামত উপেক্ষিত। ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে আদিবাসী নারীরা বরাবরই বঞ্চিত হয়ে আসছে।
- বিভিন্ন রাজনৈতিক সহিংসতার (ভূমি দখল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সামরিক অভিযান) মূল শিকার হয় নারীরা। পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীদের উপর হত্যা, ধর্ষণ, শ্লীলতাহানী ইত্যাদি ধরণের সহিংসতা ও নির্যাতনের ঘটনা ধারাবাহিকভাবে সংগঠিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এ ধরণের সহিংসতা ও নির্যাতন এ অঞ্চলের নারীদের উপর এক, *আদিবাসী হিসেবে* ও দুই, *নারী হিসেবে* করা হয়। এমন কি পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ১০ বছর পরও এ ধরণের সহিংসতা ও নির্যাতন কমার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।
- শ্রমের ক্ষেত্রে নারীদের মজুরীতে বৈষম্য করা হয়। ব্যবসা ক্ষেত্রেও নারীদের অংশগ্রহণ নাম মাত্র। চাকরীর ক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হলেও এখনো চাকরীতে অংশগ্রহণকারী নারীদের সংখ্যা খুবই কম। উচ্চ পর্যায়ে নাই বললেই চলে।
- এনজিও ঋণ সুবিধা গ্রহণে নারীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয় কিন্তু তা যথাযথ ব্যবহার করার ক্ষমতা তাদের নেই।
- আমাদের নারীরা এখনো স্বাধীনভাবে বিবাহ ও সন্তান ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এখনো ছেলেদেরই বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়।
- সর্বোপরি, আমাদের সমাজে নারীদের সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়।

এ অবস্থায় উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক, পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আরও ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিতভাবে কাজ করার লক্ষ্যে "*পার্বত্য নারীদের সম্পত্তির*

অধিকার নিশ্চিত করা হোক"-এ প্রতিপাদ্য বিষয়টি সামনে রেখে আমরা উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের দ্বিতীয় পার্বত্য নারী সম্মেলন-২০০৭ আয়োজন করতে যাচ্ছি।

প্রিয় সুধীবৃন্দ,
আমরা মনে করি, আমাদের পার্বত্য নারীদের সম্পত্তির অধিকার হলো মানবাধিকার এবং এটা নিশ্চিত করা প্রতিটি মানুষের মানবিক কর্তব্য। এটা একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন বিভিন্ন মাঠ পর্যায়ের সংগঠন তথা আমাদের প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও জনসচেতনতা। আসুন, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে মিলে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হই এবং নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। পরিশেষে আমাদের এ সম্মেলন সফল হোক। নারীর অধিকার আদায়ের অন্দোলন সফল হোক। নারী অধিকার আদায়ের কাজে সকলে সামিল হই।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ: প্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম

(২১ ডিসেম্বর ২০০৯ইং রাঙ্গামাটির শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের ৪র্থ পার্বত্য নারী সম্মেলনে উপস্থাপিত ধারণাপত্র।)

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার পদ্ধতি বৃটিশ আমল থেকেই প্রচলিত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বৃটিশ সরকার এ দেশের শাসন ভার ক্রমান্বয়ে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে স্থানীয় লোকদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয় সরকার পদ্ধতি চালু করে। পাকিস্তান আমলে ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালিত হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ আইন নতুনভাবে প্রবর্তন করা হয়। আশির দশকে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি চালু হয়। ১৯৭৬ সালে এসব পরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্ব শুরু হয় প্রতি ইউনিয়নে ২ জন মহিলা সদস্য মনোনয়নের মাধ্যমে। ১৯৮৩ সালে প্রতি ইউনিয়নে ৩ জন নারী সদস্য মনোনয়ন দেয়ার বিধান হয়। পরে ১৯৯৩ সালে প্রতি ইউনিয়নে ৯টি ওর্য়াড এবং নারীদের জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত করে চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। অবশেষে অব্যাহত নারী আন্দোলন, সচেতনতা ও বিভিন্ন সেক্টরে এডভোকেসীর কারণে ১৯৯৭ সালে সরকার কর্তৃক ৯ ওয়ার্ড-এর প্রতি ৩ ওয়ার্ডে সংরক্ষিত আসনে ১ জন নারী সদস্যের সরাসরি নির্বাচনের বিধান হয়। এ বিধানের ফলে গ্রামীণ নারী সমাজের সাথে সারাদেশ আলোড়িত হয়। স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোও পরিবর্তিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বহুমাত্রিক সংস্কৃতি ও শাসন কাঠামো এবং স্বতন্ত্র ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি বিশেষ অঞ্চল। সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ঐক্যতান যেমনি রয়েছে এ অঞ্চলে, তেমনি এই বৈচিত্র্যতার ফলে বহুমাত্রিক রূপও পেয়েছে এখানকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা।

স্মরণাতীত কাল থেকে শাসন কাঠামোর দিক দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। এখানে যেমনি রয়েছে প্রথাগত শাসন কাঠামো তথা ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত

সামাজিক প্রশাসন ব্যবস্থা তেমনি সমান্তরালে বিরাজ করছে দেশের সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও স্থানীয় সরকার কাঠামো। এসব স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে দায়বদ্ধ।

স্থানীয় সরকার বলতে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত এমন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে বুঝায় যাদের দায়িত্বাবলী নির্দিষ্ট স্বীয় এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে, দায়িত্বাবলী পালনের নিমিত্তে নিজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে কর ধার্য করতে পারে। যদিও জাতীয় সরকার জনস্বার্থে এ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করে, এগুলো জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করে বা জাতীয় সরকারের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল থেকে সবদিক দিয়ে আলাদা ও স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এখানকার প্রশাসনিক কাঠামোতেও আমরা এই চিত্র দেখতে পাই। বর্তমানে এ অঞ্চলে তিন ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

১. **ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক ব্যবস্থা:** সার্কেল চীফ, হেডম্যান ও কার্বারী।

২. **বিশেষ স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা:** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ।

৩. **স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা:** স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা।

৪. **সাধারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা:** জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন।

এখন দেখা যাক, এসব প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রবেশাধিকার কী রকম এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে নারীদের কী ধরনের ভূমিকা রয়েছে।

ঐতিহ্যবাহী প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তিন সার্কেল চীফ পুরুষ, হাতে গোনা কয়েকজন নারী হেডম্যান/কার্বারী ছাড়া বাকী সব হেডম্যান ও কার্বারী হচ্ছে পুরুষ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃত্বের কাঠামোতে (ঐতিহ্যবাহী, নির্বাচিত স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান) আদিবাসী নারীর প্রতিনিধিত্বের কোন জোরালো উপস্থিতি দেখা যায় না। কী নির্বাচিত, কী ঐতিহ্যবাহী কোন প্রতিষ্ঠানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আদিবাসী নারীর কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ নেই। যদিও পার্বত্য রাজনীতিতে সক্রিয় আদিবাসী ব্যক্তিবর্গ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের সশস্ত্র সংগ্রামে আদিবাসী নারীর অবদানের কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করেন কিন্তু তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির প্রতিফলন তারা কার্যক্ষেত্রে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার প্রমাণ নির্বাচিত স্থানীয় ও আঞ্চলিক সংস্থায় নারীদের জন্য সীমিত আসন

ব্যবস্থা। আসন যেমন সীমিত তার সাথে সংগতি রেখে নারীদের ভূমিকাও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ২২ সদস্যবিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে নারী প্রতিনিধিত্ব মাত্র ৩ জন নারী সদস্যের মধ্যে, যেখানে ২ জন আদিবাসী নারী সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অর্ন্তবর্তীকালীন জেলা পরিষদগুলোতে ৫ জন সদস্যের মধ্যে এ যাবত পর্যন্ত কোন নারী সদস্যকেই অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি। কেবলমাত্র বান্দরবান জেলার অন্তর্বর্তী পরিষদে ২০০১-২০০৬ মেয়াদে পরিষদ চেয়ারম্যান ছিলেন নারী। আর বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলার অন্তর্বর্তী পরিষদে মনোনীত ৫ সদস্যের মধ্যে ১ জন হচ্ছেন নারী।

নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদে এক তৃতীয়াংশ ও উপজেলা পরিষদে ১টি। উপজেলা পরিষদ কাঠামোতে উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদের সকল চেয়ারম্যানগণ পদাধিকার বলে সদস্যপদ লাভ করেন।

সাধারণ প্রশাসনিক দপ্তরগুলোতেও সকল স্তরে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা খুব একটা সন্তোষজনক নয়। যদিও নির্দিষ্ট কয়েকটি পেশায় যেমনঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্যাংক, নারী বিষয়ক অধিদপ্তরগুলোতে নারীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে পরিলক্ষিত হয়।

এইতো গেল, নারীর প্রবেশাধিকার বা উপস্থিতির কথা। এখন দেখা যাক এসব প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেসব নারী কাজ করছেন তারা কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন। প্রতিষ্ঠানগুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রকে আরো সুসংহত করার সুযোগ/প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে যে এক তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব প্রথা চালু রয়েছে তার সংখ্যাগত থেকে গুণগত মান বৃদ্ধির কথাও ভাববার সময় হয়েছে। নারীর উন্নয়নের জন্য যেসব নীতিমালা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয় তাতে লক্ষিত উপকারভোগীদের (নারী সমাজ) কার্যকর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি গৃহীত নারী উন্নয়ন নীতিমালাসহ সকল ধরণের নারী ক্ষমতায়নের নামে গৃহীত কর্মসূচীগুলো পর্যালোচনার জন্য পর্যালোচনা টীম গঠন করা দরকার। পার্বত্য নারীদের কোন দিকগুলো সুফল বয়ে আনবে আর কোন দিকগুলোর সংশোধনীর প্রয়োজন রয়েছে সে বিষয়গুলো নেই বললেই চলে।

কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আদিবাসী নারীদের সম্পৃক্ততা সাধারণত দেখা যায় না। এমনকি নারীদের জন্যও নির্দিষ্ট ও চিরায়ত পারিবারিক অনুশাসন থেকে কোন নারী নিজেকে অবমুক্ত

রাখতে পারলেও স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোতে তাদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে পুরুষ প্রাধান্যপূর্ণ সমাজে সাধারণত অনীহা লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী অর্থনীতির চাকাকে যে নারী নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে রাত দিনের পরিশ্রমের ফলে সচল করে রেখেছে, সমাজের সার্বিক কল্যাণে তার মতামতের কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না।

বিশ্বব্যাপী আজ নারীরা বঞ্চিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত ও বিভিন্নভাবে বৈষম্যের শিকার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা আজ বিশ্বব্যাপী শিকড় গেড়ে আছে তাতে নারীদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীরা আজ নারী হওয়ার কারণে, আদিবাসী হওয়ার কারণে এবং দরিদ্র হওয়ার কারণে একেবারেই প্রান্তিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

নারীরা এরকম অসহায় অবস্থায় থাকার পেছনে মূল কারণ খোঁজার জন্য মানব ইতিহাসের শুরুর দিকের আদি সমাজ ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই - সে সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে না ছিল ভেদাভেদ, না ছিল বঞ্চনা, না ছিল বৈষম্য। এর মূল কারণ, সম্পত্তি কারো ব্যক্তি মালিকানায় ছিল না। সমাজ পরিবর্তনের এক পর্যায়ে এসে যখন নতুন নতুন উৎপাদন যন্ত্র আবিস্কৃত হল, উৎপাদন পদ্ধতি বদলে গেল এবং নারী পুরুষের মধ্যে কাজের বিভাজন হল সম্পত্তি পুরুষের দখলে চলে গেল আর সেদিন থেকে শুরু হল নারীর প্রতি নানা ধরণের নিপীড়ন, নির্যাতন, বঞ্চনা ইত্যাদি। কাজেই এসব থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই এ সমাজ ব্যবস্থাকে ভাঙ্গতে হবে অন্যথায় নারী মুক্তির স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

আশার কথা বর্তমান নির্বাচিত সরকার-এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারী ক্ষমতায়নের জন্য ইতিমধ্যে তাঁর আন্তরিকতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমনঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, সংসদ উপনেতাসহ আরো অনেক শীর্ষ পদগুলোতে নারীদের অধিষ্ঠিত করেছেন। বিগত সময়ে এই রাজনৈতিক দলীয় সরকারের আমলেই ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি বাস্তবায়নসহ পার্বত্য নারীদের ক্ষমতায়নের যথাযথ উদ্যোগ বর্তমান সরকার গ্রহণ করবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

তাই এ সম্মেলনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের প্রতি আমাদের দাবীঃ

১. মহান জাতীয় সংসদে তিন পার্বত্য জেলা থেকে নারীদের জন্য তিনটি সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ করা হোক।

২. পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোতে নারী সদস্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হোক।

৩. স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কর্তব্য ও দায়-দায়িত্বসহ নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হোক।

৪. সিডো, সিডো'র অপসনাল প্রটোকল, বেইজিং প্লাটফরম, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs), জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫. ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৩৩ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে উন্নীত করা হোক।

****

আদিবাসী নারীর বিড়ম্বনা: প্রেক্ষাপট পার্বত্য চট্টগ্রাম

(১৫ জুন ২০১১ইং খাগড়াছড়ির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিতব্য উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক-এর ৫ম পার্বত্য নারী সম্মেলনে উপস্থাপিত ধারণাপত্র। ধারণাপত্রটি উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট গবেষক প্রফেসর মংসানু চৌধুরী।)

একদা নিসর্গের দূহিতা পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রকৃতির অপার সম্ভার আর অপরূপ সুষমা দিয়ে মুগ্ধতা ছড়িয়েছিল আগন্তুক পরিব্রাজকদের বিস্ময়ভরা দু'চোখে। যেদিকে দু'চোখ যায় গায়ে ঘন-সবুজ বনের আচ্ছাদন নিয়ে অসংখ্য ছোট-বড় পাহাড়ের আন্দোলিত বিস্তার অবলোকনে প্রতিটি সৌন্দর্য্য-পিয়াসী মানুষ হৃদয়ের গভীরে অনুক্ষণ এক অনাস্বাদিত স্বর্গীয় আনন্দের বহমান ফল্গুধারার অস্তিত্বকে অনুভব করতে পেরেছিল। পাহাড়, নদী, অরণ্যের এমন নান্দনিক যুগলবন্ধন এ আরণ্য-জনপদকে করেছে অপরূপা। পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ঝর্ণার অবিশ্রান্ত কলতান, অরণ্যের নৈশব্দ ভাষা, সুউচ্চ পাহাড়ের ধ্যানী মৌনতা এ পার্বত্য-প্রকৃতিকে করেছে রমণীয়, মোহনীয়। ভোগবাদের প্রান্ত-সীমার বহু দূরে এ পার্বত্য জনপদে জীবনের আটপৌঢ়ে চাহিদায় তুষ্ট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর হৃদয়মূলে অনাবিল শান্তি অন্তঃসলিলা হয়ে বহমান ছিল। চাহিদা ছিল ক্ষুদ্র, প্রাপ্তিও ছিল সামান্য। কিন্তু আনন্দ ছিল অপরিমেয়, হাসি ছিল আকর্ণ। অতঃপর বিষয়ী ও মতলবী মানুষের চোখ পড়তে দেরী হয়নি এ অরণ্য ভূ-খন্ডে। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ আর আধিপত্যবাদের হাত ধরে ক্ষমতাধর প্রভূদের কায়েমী স্বার্থ শিকড় গেড়েছে এখানে অনেকদিন থেকে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এ অঞ্চলের আস্তানা গুটিয়ে নিলেও অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদ সেই খালি আসনে স্থায়ী হয়েছে। ফলে আগ্রাসন, শোষণ আর নিপীড়নের প্রক্রিয়ায় কোন ছেদ পড়েনি। বরঞ্চ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেখানে সম্পদ লুন্ঠনে তাদের শোষণ প্রক্রিয়াকে সীমিত রেখেছিল সেখানে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদী ও আধিপত্যকামীরা সম্পদ ছাড়াও ভূমিগ্রাসীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের প্রান্তিক অবস্থানের দিকে যাত্রা তাই থেমে যেতে পারেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি হয়েছে বিপর্যস্ত। দিন যাপনের গ্লানি হয়েছে অসহনীয়। আপন মর্যাদায় মাথা উঁচু করে চলার অধিকার হয়েছে ভূলুণ্ঠিত।

ফলে ঐশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা অপাপ-বিদ্ধ শান্তি তাই নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে করে নিয়েছে সম্ভম হারানোর ভয়ে। এখানকার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এ ত্রিশঙ্কু অবস্থার জন্য সরকারের একচোখা নীতি অনেকাংশে দায়ী। আর এ নীতির সবচেয়ে অসহায় বলি হলো আদিবাসী নারী।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজ জুম চাষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে শতবর্ষ ধরে। এখনও জুম চাষ এখানকার আদিবাসী অর্থনীতির একটি শক্ত খুঁটি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে। আদিবাসী গৃহস্থ পরিবারের জীবিকার একটি বড় অবলম্বন হিসেবে এখনও জুমের অবস্থানের শক্ত ভিত নড়ে যায়নি কৃষি-জগতে নানান অগ্রগতির পরেও। জুম চাষের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বনজসম্পদও আদিবাসীদের জীবিকার একটি বড় উৎস। এই আরণ্য জনপদে শতাব্দীকাল ধরে আদিবাসী জনগোষ্ঠী পাহাড়ের বুকে ফসল বুনেছে শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহের তাগিদে। সেখানে মুনাফার কোন প্রত্যাশা ছিল না, ছিল না কোন বিলাসিতার মোহ। জীবন-নির্বাহী জীবিকার এ ব্যবস্থাতেই তারা তৃপ্ত ছিল।

আদিবাসী জীবন ও জীবিকার এ চিত্রকল্পে আদিবাসী নারীকে আমরা দ্বৈত ভূমিকায় আবিষ্কার করি - উৎপাদন এবং সংজনন অর্থাৎ ফসল বোনা ও সন্তানের জন্ম দেয়া। এ দ্বৈত ভূমিকায় আদিবাসী নারী একদিকে প্রেমময়ী স্ত্রী ও স্নেহময়ী মা, অন্যদিকে একজন সক্রিয় উৎপাদনকারী। তাকে সন্তানের জন্ম দেয়া ও তাদের লালন করা, গৃহাঙ্গনের যাবতীয় কর্ম, জুমের ফসল বোনা থেকে শুরু করে ফসল তোলার সময় পর্যন্ত জুম সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার কাজ, বন থেকে বনজ দ্রব্য আহরণের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম সবই তাকে দিয়ে যেতে হয় উদয়াস্ত। এমনকি উৎপাদিত দ্রব্য বেচা ও গৃহস্থালির জন্য অপরিহার্য দ্রব্য কিনতে তাকে বাজার পর্যন্ত চলে আসতে হয়। বাজারে গিয়ে চতুর ব্যাপারীদের খপ্পরে পড়ে, ভাষা ভালো না বুঝতে পেরে এই সহজ-সরল আদিবাসী গৃহবধূটি দামে প্রতারিত হয়। দিনের পর দিন অপরিসীম শ্রম দিয়ে উৎপাদিত ফসল কিংবা আহরিত বনজ সামগ্রী যে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে তারা বাজারে নিয়ে আসে তার ন্যায্য দাম পাওয়া থেকে ক্রমাগত বঞ্চিত হয়ে চলে। এভাবে উপার্জিত অর্থে তেল, নুন ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী কিনতে গিয়ে আবারও তাকে প্রতারিত হতে হয় বাজারের দোকানীর কাছে। প্রতারণা, বঞ্চনা এ সব খেটে খাওয়া আদিবাসী নারীদের নিত্য সঙ্গী। আবার কাজের ফাঁকে সামান্য অবসরে কাপড় বুনতে বসে যায়। দেহের একটুখানি সুখ, যত্ন, রূপ পরিচর্যার কথা তাকে ভুলে যেতে হয়। এ সব তো তার জন্য বিলাসিতা। ঘুর্ণাক্ষরেও কখনো কি তার মনে এই চিন্তার উদয় হয়েছে যে,

তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে? তার মানবাধিকার লংঘন হয়েছে?

পুঁজির অব্যাহত বিকাশের ধারায় মূলধারার জনগোষ্ঠীর ক্রমসম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের মুখে অসহায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকালয়, জীবিকার উৎস বন-পাহাড়-জমি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে তাদের জীবন ধারণ প্রক্রিয়াকে সংকটাপূর্ণ করে তুলেছে। তাদের জীবন ধারণের সমস্ত অবলম্বনকে ভয়াবহ সংকটের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। আদিবাসীদের জীবিকার ভিত্তি, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির মধ্যে যে একটা অবিচ্ছিন্ন বন্ধন ছিল তা ক্রমশ ক্ষীণতর হয়েছে। আর এ নাজুক অবস্থার অনিবার্য বলি হলো আদিবাসী নারী।

আদিবাসী সমাজে নারীরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যমন্ডিত অলংকারে, পোষাকে-আচ্ছাদনে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের মূর্ত প্রতীক। আবহমান ঐতিহ্যের ধারায় আদিবাসী নারী নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীরাও নিজেদের নৃ-পরিচয় ও ঐতিহ্যকে ধারণ করে এমন পরিধেয় ও ব্যবহার্য বিভিন্ন পদের কাপড় নিজস্ব তাঁতে তৈরী করে। এ সব বেশ-ভূষা দর্শণে ঐ নারী কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তা সহজে চেনা যায়। বিভিন্ন উৎসব পার্বণাদিতে মদের ব্যবহার আদিবাসী সমাজের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যও বটে। মদ তৈরীর বিভিন্ন কৌশল আদিবাসী নারীরাই আবহমানকাল ধরে রেখেছে। এছাড়া বিভিন্ন আদিবাসী সমাজে রন্ধন শৈলী, পিঠা-পুলি তৈরীর ধারাও ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রন্ধন-কলা রীতিমত বিস্ময়কর। আদিবাসী নারী যাদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, প্রশিক্ষণ নেই, প্রচলিত কোন মশলার ব্যবহার নেই-শুধুমাত্র জুমে গজিয়ে উঠা কিছু পাতা-গুল্ম সহযোগে রান্না এত উপদেয় হতে পারে তা চেখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আদিবাসী নারীদের জন্য এটি একটি অহংকারের স্থান। আর সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ও কার্যকর বাহন ভাষাকে সন্তান সন্ততির মাধ্যমে সঞ্চারিত করে দিচ্ছে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের মুখের ভাষা এখনও যেটুকু পর্যন্ত টিকে আছে তা এই ঐতিহ্যনুরাগী মমতাময়ী নারীদের কল্যাণে। এ অঞ্চলের প্রায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব নৃত্যকলা, সঙ্গীত রয়েছে। নাচে এবং গানে ছেলে ও মেয়েদের সমান অংশগ্রহণ থাকলেও কিন্তু এসব কাজে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত এবং কারণে অকারণে, কাজের ফাঁকে নাচ-গানের চর্চা মেয়েদের মধ্যেই বেশি। ফলে আদিবাসী সংস্কৃতির এই দিকটাও মূলতঃ আদিবাসী মেয়েরাই ধরে রেখেছে।

আদিবাসী সমাজে নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত। সারাজীবন নিজেকে উজার করে দিয়ে পরিবারের সুখে-দুঃখে, জীবিকা সংগ্রহের কাজে যে

আদিবাসী নারী উদয়াস্ত খেটে চলে তার বিনিময়ে প্রাপ্তি একবারেই শূন্য। পিতার সংসারে না পিতৃ সম্পত্তির অংশের অধিকার, না স্বামীর সংসারে স্বামীর সম্পত্তির অংশের অধিকার। পিতৃ সংসারে থাকলে নারীর বিয়ে না হওয়া অবধি কেবলমাত্র ভরণপোষণের অধিকার ছাড়া আর অন্য কোন সম্পদে তার কোন অধিকার নেই। আবার মায়ের সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কয়টা মা এরূপ সম্পদ ধারণ করতে পারে, সে প্রশ্নও থেকে যায়। সুতরাং পিতার কিংবা স্বামীর অবর্তমানে সন্তানরাও যদি যে যার মত আলাদা হয়ে যায় তখন সেই নারীর কি অবস্থা হবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? এ প্রশ্নের কে উত্তর দেবে? পার্বত্য চট্টগ্রামে শুধু মারমা জনগোষ্ঠী ছাড়া প্রায় সকল আদিবাসী সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা বৈষম্যমূলক।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারী পৃথিবীর আরও অনেক আদিবাসী সমাজের অনুরূপ নিগ্রহ ও বৈষম্যের শিকার হয় সাধারণত দু'ভাবে:

ক. আন্তঃ-সামাজিক বৈষম্য:

বিদ্যমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে নারীদের পুরুষের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়েছে। এখানে নারীর ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ তার ভূত-ভবিষ্যত, লেখাপড়া, বিবাহ, স্বাস্থ্য রক্ষা, সন্তান ধারণ সবকিছুরই নিয়ন্তা পুরুষ। আহার প্রস্তুত, ভোজন ক্রিয়া ও পর্ব সম্পাদনের জন্য যা যা করণীয় সেখানে পুরুষের অংশগ্রহণ অনুপস্থিত। যন্ত্রের মত নারী সেখানে খেটে চলেছে সেই কাক ডাকা ভোর থেকে নিশুতি রাত পর্যন্ত বিরামহীন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারী-পুরুষের মধ্যে এই বিভাজন রেখা টেনে রেখেছে। আমরা কোন বিবেকবোধ ও যুক্তির প্রয়োগ ছাড়াই এ বিভাজন রেখাকে মেনে নিয়েছি। মানুষ হিসেবে নারীর অধিকারকে পদদলিত করে তার বঞ্চনার পরিধিকে বৃদ্ধি করে চলেছি। মানুষ হিসেবে নারীর অধিকার যদি পদদলিত হয় তবে পুরুষও মানুষের দাবিতে সমাজে যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে চলেছে সেই অধিকার সে দাবি করতে পারে কি? এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। পুরুষের কাছে এ প্রশ্নের কী উত্তর আছে?

খ. বহিঃ সামাজিক বৈষম্য:

এ বৈষম্য মূলতঃ আধিপত্যকামী সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী থেকে উৎসারিত। দু'যুগেরও বেশি সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলন চলেছিল। ১৯৯৭ সনে পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে এ অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক ইতি টানা হলেও পরিস্থিতির তেমন কোন গুণগত পরিবর্তন হয়েছে এমনটা বোধ করি দাবি করা যাবে না

বিরাজমান বাস্তবতার বিচারে। কথিত সংঘাতে হাজার হাজার প্রাণের বলি চড়ানো হয়েছে জিঘাংসার কৃপাণে। চরম মূল্য দিতে হয়েছে আদিবাসী নারীকে। পাশবিক লালসার শিকার হয়েছে অসংখ্য আদিবাসী রমনী। অপহৃত হয়েছে অনেকেই। জবরদস্তি পাণিপীড়ন করা হয়েছে এমন আদিবাসী নারীর সংখ্যাও মোটেই ফেলনা নয়। আদিবাসী নারীর নাজুকতা একাধিক– প্রথমতঃ সে নারী। পুরুষ যতক্ষণ পর্যন্ত একজন নারীকে শুধু তার সামাজিক পরিচয়ে নারী রূপেই দেখবে, মানবিক পরিচয়ে মানুষ হিসেবে গণ্য করবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ পুরুষের কাছে নারী নিরাপদ নয়। এরপর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হ'লো - সে কোন পক্ষের নারী। উত্তর যদি হয় প্রতিপক্ষের, তাহলে সে নারী আরও বেশি অনিরাপদ প্রতিপক্ষ ঐ পুরুষের কাছে।

দ্বিতীয়তঃ সে নারী, কিন্তু আদিবাসী। অধিকার ও বঞ্চনার বিচারে তার অবস্থান প্রান্তিকে। অতএব দুর্বল, নিপীড়নের সবচেয়ে অসহায় শিকার। তদুপরি শারীরিক গঠনে, পোষাকে -আশাকে, আকারে-বিচারে ভিন-জাতির পুরুষের কাছে তার অন্যরকম আবেদন। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী মূলধারার জনগোষ্ঠীর প্রায় ০.৭৫%। এ নগণ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে যখন অস্ত্রের ব্যবহারের সিদ্ধান্তে যেতে হয় তখন সেখানে বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার মত মধ্যযুগীয় সামন্ত মানসিকতা প্রাধান্য পাবে এটাই স্বাভাবিক। সামন্ত মানসিকতার কাছে মানবাধিকার, মানবিকতার মূল্য, আদিবাসী রমনীর সম্ভ্রম হারানোর বেদনার মূল্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে অনিশ্চয়তা আদিবাসী নারীদের নিরাপত্তার ঝুঁকিকে জিইয়ে রেখেছে। চুক্তি পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসিত সমতলবাসীদের দ্বারা আদিবাসী নারী নির্যাতনের হার বেড়েছে। ধর্ষণের শিকার আদিবাসী নারী শুধু শারীরিকভাবে বিধ্বস্ত হয়নি মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়েছে। অপমান ও অবমাননার দুঃসহ স্মৃতি সারাজীবন তাদের বয়ে বেড়াতে হচ্ছে যা ভাষায় অপ্রকাশ্য।

অন্যান্য অনেক সমাজের মত শৈশবাবস্থাতেই আদিবাসী মেয়েদের কাজের ধারা নির্ধারিত হয়ে যায়। বোঝার বয়স হওয়ার সাথে সাথেই প্রতিটি মেয়ের ভাবনায় এ চিন্তাটাই অনবরত ঢোকানোর চেষ্টা করা হয় যে, তাকে বিয়ে করে সন্তান ধারণ, সন্তান লালন করতে হবে। এটিই নারীর ধর্ম। অন্যসব কাজকর্ম, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ সবই গৌণ। বিপরীতে, একটি ছেলেকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য তৈরী করা হয়, উৎসাহ দেয়া হয়, কারণ সে রোজগেরে হবে। আর মেয়ে সন্তানকে অন্যান্য গৃহকর্ম ছাড়াও হেঁসেলে ঢুকতে হবে আহার্য্য-পানীয় তৈরীর জন্য। ফলে

লিঙ্গভিত্তিক এ কর্ম-বিভাজনের কারণে অন্যান্য অনেক সমাজের অনুরূপ অনেক আদিবাসী মেয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়ে উঠে না। বিদ্যালয়ে মেয়েদের ঝরে পড়ার হার, অশিক্ষিত থেকে যাবার হার এ কারণে অনেক বেশি।

শিক্ষায় মেয়েদের অধিগমনের সুযোগ কম কারণ দূর দূরান্তে মেয়ের নিরাপত্তার বিষয়টিও মেয়েকে উচ্চ শিক্ষা প্রদানে অভিভাবকদের নিরুৎসাহিত করে। সামাজিক যে দর্শনটি নারী শিক্ষার উৎসাহে রাশ টেনে ধরে তা হলো বিয়ের পর মেয়ে পরের ঘরে চলে যাবে কিন্তু ছেলে বিয়ে করে ঘরে বউ নিয়ে আসবে, আয়-রোজগার করবে। অতএব তাকে শিখতে হবে, বিদ্যা অর্জন করতে হবে যা নারীর প্রয়োজন নেই। এছাড়াও বিদ্যালয়ের দূরত্ব, দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থা, ভাষিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদিও নারী শিক্ষাকে অনেকখানি বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতা আদিবাসী নারীর মানবিক অধিকারকে অনেখানি ক্ষুণ্ন করেছে।

স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি প্রতিটি মানুষের অধিকার। কিন্তু নারী হওয়ার সুবাদে আরও কতিপয় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যা কেবল মাত্র নারীদের জন্য প্রযোজ্য। যেমন, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা। এটি নারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে এমনিতেই নারীর অবস্থান প্রান্তিক। আদিবাসী নারীর অবস্থান আরও প্রান্তিক। ফলে তার অবস্থান বড় বেশি নাজুক ও ভঙ্গুর। সমাজে বিদ্যমান পারিপার্শ্বিকতার পটভূমিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আদিবাসী নারীর যে নির্ধারিত অবস্থান তা মূলধারার জনগোষ্ঠীর আর দশটি নারীর অবস্থান অপেক্ষা অনেক নীচে। এ বৈষম্যজনিত সংকটের হাত ধরে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, স্বাস্থ্য সেবার অপ্রতুলতা তৈরী হয়েছে যা আদিবাসী নারীর স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির অধিকারকে সংকুচিত করেছে। অধিকার ক্ষুণ্ন করা একটি সাংবিধানিক অপরাধ। স্বাস্থ্য অধিকার থেকে বঞ্চনার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারীদের মধ্যে রক্তশূণ্যতার ব্যাপকতা, প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা, শিশু মৃত্যুর হার রীতিমত অস্বাভাবিক। উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য হুমকির পাশাপাশি রোগ-বালাই, অসুখ-বিসুখ বৃদ্ধির প্রবণতা কিন্তু অনেক বেশি দৃশ্যমান। পরিবারে, সমাজে উপেক্ষিত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত আদিবাসী নারী এ সব রোগব্যাধির সহজ শিকার।

পরিবেশের অবনয়নে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আদিবাসী নারী। বিশ্বের উষ্ণায়ন, কিছু সংখ্যক অর্থগৃধ্নু মানুষের উদগ্র লালসার শিকার হয়ে পার্বত্য

চট্টগ্রামের উষ্ণমন্ডলীয় বিশাল বনভূমি আজ বিরান প্রান্তরের রূপ ধারণ করেছে। এই অরণ্য নিধন পুরুষ অপেক্ষা আদিবাসী নারীকে আঘাত করেছে বেশি। রান্না-বান্না, পানি ও জ্বালানি সংগ্রহে তার কষ্টের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে কারণ এগুলোর প্রাপ্তিস্থল আরও দূরে সরে গেছে। আদিবাসী জীবনের অস্তিত্ব এবং চলমানতা একান্তই প্রকৃতি প্রদত্ত সম্ভারের প্রাপ্যতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। খাদ্য, জ্বালানি থেকে শুরু করে দৈনন্দিন সব প্রয়োজনীয় উপকরণের জন্য প্রতিটি আদিবাসীকে তার লোকালয় সংলগ্ন বন ও পাহাড়ের উপর নির্ভর করতে হয়। আর এসব উপকরণের অধিকাংশই নারীরাই সংগ্রহ করে নিয়ে আসে বেশি। আদিবাসী নারী জানে যে প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হলে, বন উজার হলে তাকেই সংকটে পড়তে হবে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় আদিবাসী নারীর রয়েছে অনন্য ভূমিকা। এ সম্পদ রক্ষার জ্ঞান তার নিজেরই স্বার্থে তাকে আয়ত্বে আনতে হয়েছে। আমরা সচরাচর যা দেখি, বনে গেলে আদিবাসী নারী কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুই আহরণ করে না।

অতীতে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক মৌজাতেই হেডম্যান/কার্বারীর নেতৃত্বে পাড়াবাসীদের অংশ গ্রহণে তাদের গৃহস্থালীর প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে 'ভিলেজ কমন ফরেস্ট' নামে বিশাল এলাকা জুড়ে প্রাকৃতিক বন সৃষ্টি করা হতো। এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন কোন মৌজায় এধরনের বনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের বন থাকায় পাড়াবাসীরা যেমন তাদের প্রয়োজনীয় আহার্য্য, জ্বালানি ইত্যাদির নিশ্চয়তা পেত তেমনি তাদের পানির উৎসও রক্ষিত হতো। এ বন সৃষ্টিতে পুরুষদের চাইতেও নারীদের ভূমিকা ছিল অনেক বেশি। অথচ প্রাকৃতিক এ সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর ব্যাপক ভূমিকা থাকার পরও মৌজার অর্ন্তগত 'ভিলেজ কমন ফরেস্ট' ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীদের কোন অংশগ্রহণ নেই। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এখানেও আদিবাসী নারীকে তার প্রাপ্য ভূমিকা পালন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতৃত্বের কাঠামোতে (ঐতিহ্যবাহী, নির্বাচিত স্থানীয় ও আঞ্চলিক সংস্থা) আদিবাসী নারীর প্রতিনিধিত্বের কোন জোরালো উপস্থিতি দেখা যায় না। কী নির্বাচিত, কী ঐতিহ্যবাহী কোন সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আদিবাসী নারীর কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ নেই। যদিও পার্বত্য রাজনীতিতে সক্রিয় আদিবাসী ব্যক্তিবর্গ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের সশস্ত্র সংগ্রামে আদিবাসী নারীর অবদানের কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করেন কিন্তু তার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির প্রতিফলন তাঁরা কার্যক্ষেত্রে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার প্রমাণ নির্বাচিত স্থানীয়

ও আঞ্চলিক সংস্থায় নারীদের জন্য সীমিত আসন ব্যবস্থা। আসন যেমন সীমিত তার সাথে সংগতি রেখে নারীদের ভূমিকাও অনুল্লেখযোগ্য। ২২ সদস্য সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও ৩৪ সদস্য সম্বলিত প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে নারী প্রতিনিধিত্বকে মাত্র ৩ জন নারী সদস্যের মধ্যে-যেখানে ২ জন আদিবাসী নারী-সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। অর্ন্তবর্তীকালীন জেলা পরিষদগুলোতে ৫ জন সদস্যের মধ্যে এ যাবৎ পর্যন্ত কোন নারী সদস্যকেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। কেবলমাত্র বান্দরবান জেলার অর্ন্তবর্তী পরিষদে ২০০১-২০০৬ মেয়াদে পরিষদ চেয়ারম্যান ছিলেন নারী আর বর্তমানে রাঙ্গামাটি জেলার অর্ন্তবর্তী পরিষদের মনোনীত ৫ সদস্যের একজন নারী।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রতিষ্ঠানেও (রাজা, হেডম্যান, কার্বারী) দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া নারী প্রতিনিধিত্ব অনুপস্থিত। কোন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আদিবাসী নারীদের সম্পৃক্ত হতে সাধারণত দেখা যায় না। এমনকি নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ও আচরণীয় চিরায়ত পারিবারিক অনুশাসন থেকে কোন নারী নিজেকে অবমুক্ত রাখতে পারলেও স্থানীয় ক্ষমতাকাঠামোতে তাদের অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে পুরুষ প্রাধান্যপূর্ণ সমাজে সাধারণত অনীহা লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী অর্থনীতির চাকাকে যে নারী নিজের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে রাত-দিনের পরিশ্রমে সচল রেখেছে, সমাজের সার্বিক কল্যাণে তার মতামতের কোন গুরুত্ব দেয়া হবে না - সমাজের এ বিধান রীতিমত অমানবিক ও অগ্রহণযোগ্য।

এতসব আলোচনা ও বিশ্লেষণ শেষে বোধ করি শুধু একটি কথা খুব শক্ত করে বলা যায় যে, সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারী - তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে বৃহত্তর অঙ্গনে পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামের গাল ভরা বুলি শুধু বাগাড়ম্বর সর্বস্ব হয়ে আমাদের গ্লানিকে ভারী করে তুলবে। সাফল্যের সিংহদ্বার অবধি আমাদের কখনোই পৌছানো হবে না। আদিবাসী নারী কিন্তু সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির প্রয়োজনে তার পুরুষ সাথীর সহযাত্রী হয়েছে বহুযুগে বহুবার। কিন্তু তারপরেও স্ব-ভিমানী পুরুষের কাছে তার যথাযথ মূল্যায়ণ হয় নি। অবলা ভেবে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার ক্ষেত্রে তার সবলা হওয়ার সব সুযোগকে অবারিত করতে চায় নি। স্বার্থপরের মতো নিজেদের আধিপত্যকে নিরঙ্কুশ করতেই বরঞ্চ সচেষ্ট থেকেছে সব সময়। জগতের বর্ণাঢ্য ইতিহাসে আমরা বহু সফল পুরুষ, বহু অবিসংবাদিত মুক্তিসংগ্রামী নেতাদের দেখা পাই যাদের সাফল্য গাঁথার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে

তাদের সহধর্মিণী অনেক মহীয়সী নারীর অপরিসীম ত্যাগ, সীমাহীন তিতিক্ষা আর নিরবিচ্ছিন্ন অনুপ্রেরণা। তবে আশার কথা হল এই যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী সম্প্রদায়ের একটি অংশে, যদিও ক্ষুদ্র, তাদের অধিকার বিষয়ক ভাবনা ক্রমশঃ সঞ্চারিত হতে শুরু করেছে। ছোট ছোট আলোচনা সভা, কর্মশালায় তাদের সরব উপস্থিতি আমাকে রীতিমতো আন্দোলিত করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী সমাজের মানসভূবনে বঞ্চনা থেকে মুক্তির চেতনার এই উন্মেষ ক্রমে বানভাসি স্রোতের মতো প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে বৃহত্তর পরিসরে পার্বত্য আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের পথকে আরও প্রশস্ততর করবে, উৎসাহে গতি সঞ্চারিত হবে, সংগ্রামকে আরও বেগবান করে তুলবে বলেই আমার বিশ্বাস। আর পুরুষরা এখানে অনুঘটক হয়ে কাজ করুক - এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কতিপয় সুপারিশমালা:

- পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- আদিবাসী নারী শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ও সর্বাত্মক উৎসাহ দেয়া জরুরী।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আদিবাসী নারীর কার্যকর ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা বাঞ্চনীয়।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীর আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক/ আয়বর্ধনমূলক সুযোগের সম্প্রসারণ জরুরী।
- ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার সংস্থা ও জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারীর ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা দরকার।

পার্বত্য নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলন জোরদার করুন

(০৬ জুন ২০১২ইং রাঙ্গামাটির উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের ৬ষ্ঠ পার্বত্য নারী সম্মেলনে উপস্থাপিত ধারণাপত্র।)

পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী মুক্তি আন্দোলনের রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য ও ইতিহাস। আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীদের রয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ১৯৯৭ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী মুক্তি আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

২০০১ সালের ২৩ নভেম্বর, শুক্রবার কিছু নারী উন্নয়ন কর্মী পার্বত্য অঞ্চলের নারীদের অবস্থা আলোচনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। রাঙ্গামাটিতে এ সময় ছিল কঠিন চীবর দান উৎসব। কঠিন চীবর দানের অনুষ্ঠানে নারীদের আত্ম নিবেদিত ভূমিকার উপলব্ধি ছিল এক নতুন অনুপ্রেরণা। উপেক্ষিত, সুবিধা বঞ্চিত, শোষিত ও নির্যাতিত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই সভাতেই গঠিত হয় উইমেন্স টাস্কফোর্স যা পরবর্তীতে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কে রূপ লাভ করে।

২০০৪ সালে ০১ ডিসেম্বর হিল ট্র্যাক্টস এনজিও ফোরামের সম্মেলন কক্ষ, রাঙামাটিতে বিভিন্ন শুভাকাঙ্খী সংগঠনের উপস্থিতিতে উইমেন্স টাস্কফোর্সের সদস্যদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত সদস্যরা উইমেন্স টাস্কফোর্সের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার জন্য এবং এর সাংগঠনিক পরিধি সুনির্দিষ্টকরণ ও বাড়ানোর লক্ষ্যে নাম পরিবর্তন করে *"উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক"* নামকরণ করে এবং পাবর্ত্য অঞ্চলের নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের জন্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি নির্ধারণ করা হয়:

১. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জেন্ডার ইস্যু সম্পর্কে সর্বস্তরে সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২. উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নেটওয়ার্ক ও সংগঠনের সাথে সহযোগিতা করা।

৩. আদিবাসী নারী সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে এক বা একাধিক প্লাটফর্ম, নেটওয়ার্ক ও সংগঠন গড়ে তোলা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যের অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিসোর্স সেন্টার, সেল ও টাস্কফোর্স পরিচালনা করা।

৪. তৃণমূল পর্যায়ে নারী সংগঠনদের সাথে নারী অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন মহলে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার, গোল টেবিল বৈঠক, মিটিং ইত্যাদি আয়োজন করা।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসনিক কাঠামোতে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে আদিবাসী নারীসহ পার্বত্য অঞ্চলের নারী সমাজের পূর্ণ ও সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের দু'টি পরিষদ রয়েছে - সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদ। সাধারণ পরিষদ সাধারণ সদস্যদের দ্বারা গঠিত। এই নেটওয়ার্কের সদস্যরা হবেন পার্বত্য অঞ্চলে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কর্মরত বিশেষজ্ঞ নারী কর্মী; যেমন - প্রশিক্ষক/সহায়ক, প্রতিবেদন প্রস্তুতকারক, আইনী সহায়তার জন্য কর্মী, বয়স্ক ও অভিজ্ঞ নারী। অর্থাৎ নারী কর্মী যারা আসলে কোন না কোনভাবে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং পার্বত্য অঞ্চলের নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছেন তারাই নেটওয়ার্কের সদস্য হতে পারবেন।

বিগত সময়ে নেটওয়ার্কের মূল কাজ ছিল পার্বত্য অঞ্চলের নারীদের ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা। বিগত সময়ের কাজের ফলাফল পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত কতগুলি উল্লেখযোগ্য অর্জন লক্ষিত হয়:

- জনপ্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মী, ছাত্রী, মাঠ পর্যায়ের সংগঠনের কর্মীদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা ও সক্ষমতা বর্ধনমূলক কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়।
- পার্বত্য নারীর নিরাপত্তা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও স্থানীয় ও জনপ্রশাসনে নারীর কার্যকরী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে নারীর ক্ষমতায়নের বিকল্প নেই এ সকল প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পার্বত্য নারীদের সংগঠিত করার জন্য তিন পার্বত্য জেলার জেলা সদরে পাঁচটি বড় ধরনের সম্মেলন আয়োজন করা হয়। যার প্রভাব আমরা ধীরে ধীরে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কাজে দেখতে পাচ্ছি। ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ-এর জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম এর মধ্যে অন্যতম।
- তাছাড়াও উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের অনেক কর্মী দেশে ও দেশের বাইরে অনেক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে। যারই ফলশ্রুতি হিসেবে আজ আমরা নেটওয়ার্কে অনেক সক্ষম কর্মী পেয়েছি।

- এ প্রক্রিয়ার ফলে বর্তমানে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক:
  - একটি প্রশিক্ষক/সহায়ক দল আছে যারা আদিবাসী নারীর অধিকার, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, নেতৃত্ব, এডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিংসহ বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণে/কর্মশালায় সহায়তা করতে পারে;
  - একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতকারক দল আছে যারা নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরীতে দক্ষতা অর্জন করেছে;
  - এক অভিজ্ঞ নারী দল যারা পার্বত্য সমাজের মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কাজ করছে; এবং
  - সর্বোপরি, এখন একদল কর্মী উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করছে।

উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক বর্তমানে পাঁচ ধরনের কাজ পরিচালনা করছে:

১. উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ককে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালীকরণ;

২. নেটওয়ার্ক-এর কর্মী ও সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৩. মাঠ পর্যায়ের নারী সংগঠনদের সংগঠিতকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি;

৪. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও ভিক্টিমকে আইনী সহায়তা প্রদান এবং আরো সহায়তার জন্য স্থানীয়, জাতীয় পর্যায়ের আইন সংগঠনের সাথে লবি-এডভোকেসী করা; এবং

৫. নারীর প্রতি সহিংসতার তথ্য সংগ্রহ করা ও ডকুমেন্ট করা।

উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক-এর সামনে রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ যেগুলো ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট ও বর্তমান স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত। আদিবাসী নারীর সমস্যা একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। একদিকে নারী হিসাবে পিতৃতান্ত্রিক বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার, আরেকদিকে আদিবাসী পরিবারের সদস্য হিসাবে জাতিগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। আদিবাসী ব্যক্তি মানুষ হিসাবে তার যে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার তাও আজ গভীর সংকটে। নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা চর্চা ও বিকাশ ঘটানোর সুযোগ হচ্ছে সংকুচিত।

আদিবাসী নারী হিসাবে নিজ সমাজে সে একাধারে সামন্তীয় প্রথার বেড়াজালে, অন্যধারে পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশের ফলে আদিবাসীদের মূল সম্পদ ভূমির উপর থেকে মালিকানা হারাচ্ছে। আদিবাসীরা কখনো ভূমির ব্যক্তি মালিকানা দাবী করেনি এই বোধে যে "ভূমি আমাদের সম্পত্তি নয়, আমরাই এ ভূমির সন্তান"।

"ধরিত্রীমাতা" এ প্রকৃতি-পরিবেশকে তারা লালন-পালন, রক্ষা, পরিচর্যা, ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এবং বংশ পরম্পরায় একে ব্যবহার উপযোগী ও সমৃদ্ধ রাখে। এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উপনিবেশিক শক্তির দ্বারা ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সাধারণভাবে আদিবাসীরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। অন্যধারে, নারীরা আজ সম্পত্তির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং পুরুষেরা হচ্ছে আইনীভাবে বৈধ মালিক।

বর্তমানে আদিবাসী নারী মুক্তির প্রশ্নটি অনেক জটিল এবং বিভিন্ন মত ও পথের ভিন্নতাও রয়েছে। অনেক নারী কর্মী নারীদের দৈনন্দিন জীবনের সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে নারীকে সুরক্ষা দেয়ার কাজকেই গুরুত্ব দিচ্ছে। এ জন্য ব্যস্ত থাকছে আইনী সহায়তা, চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের কাজে। অনেকেই গুরুত্ব দিচ্ছে নারীর আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজকে এই বিশ্বাসে যে আইনী কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার অনেকেই যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা নারীর বঞ্চনা ও বৈষম্যের ভিত্তিভূমি তা বদলানোর জন্য কাজ করছে, যারা মনে করে প্রচলিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার রুপান্তর ছাড়া নারী মুক্তি অসম্ভব।

উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক বিগত বছরগুলোতে এই বিভিন্ন পথ ও মতের সকল কাজের সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করে আসছে। আদিবাসী নারীসহ পা· অঞ্চলের সকল নারীর প্রতি যে সহিংসতা, নিপীড়ন, নির্যাতন সংঘটিত হয়েছে ত.. বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আক্রান্ত নারীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। সম্পদের উপর আইনী মালিকানা এবং বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন সহ নানা ধরনের আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সহায়তা দিয়ে আসছে। পাশাপাশি সমাজের কাঠামোগত বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য সক্ষমতা ও শক্তি সঞ্চয় করার প্রক্রিয়াকেও সহায়তা দিয়ে আসছে। আজকের এ ৬ষ্ঠ সম্মেলন থেকে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক প্রত্যাশা করে, (১) এ প্রক্রিয়াটি অব্যাহত থাকবে; (২) সমাজে যারা নিপীড়ন, বঞ্চনা, বৈষম্য থেকে মুক্তিতে বিশ্বাসী সে ধরনের সমমনা সংগঠনগুলোর সাথে ঐক্য ও সংহতি গড়ে উঠবে; এবং (৩) এই নেটওয়ার্ক আশা করে জাতি, ধর্ম, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমতাভিত্তিক সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন চাই

(১৫ জুন ২০১৩ইং খাগড়াছড়ির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক-এর সপ্তম পার্বত্য নারী সম্মেলনে উপস্থাপিত ধারণাপত্র।)

আজ যে পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই ৭ম পার্বত্য নারী সম্মেলন করতে যাচ্ছি তখন চারদিকে শুধুই হত্যা, খুন, ধর্ষণ এর বীভৎস চিত্র। শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ছত্রছায়ায় থেকে বারে বারে ধর্ষক ও নির্যাতনকারীরা ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে সহিংসতার শিকার তুমাচিং মারমা, সুজাতা চাকমার ধর্ষণ চিত্র বিশ্লেষণ করলে এর প্রমাণ স্পষ্ট হয়। সহিংসতাকারীরা যেন এক নিরাপদ অভয়ারণ্যে বিচরণ করছে আর নিপীড়িত ব্যক্তি আরো বেশি নিরাপত্তাহীনতা, পারিবারিক-সামাজিক পীড়নের শিকার হচ্ছেন। নির্যাতন, নিপীড়ন, অপমান, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ এর শিকার হয়ে কত নারী প্রতিদিন ঘরে ঘরে গুমরে কাঁদছে, কত মেয়ে আত্মহত্যা করছে এর হিসাব শুধু নারীই জানে। এর পিছনে ঐতিহাসিক কারণ ও সামাজিক কারণ রয়েছে।

নারী ও পুরুষ মিলেই মানবসমাজ। একে অপরকে ছাড়া সমাজ গঠন হয় না, বংশগতি রক্ষা হয় না, সমাজের সৌন্দর্য্য থাকে না। কিন্তু সমস্যা হলো নারী ও পুরুষ সম্পর্কে সামাজিক ধারণায়, আমাদের চিন্তা ও চেতনায়। মানুষের যে চিন্তা ও ধারণা আছে, তা থেকেই মানুষ নারীত্ব ও পুরুষত্বকে ভাগাভাগি করে দেয়। যেমন- একজন নারীকে বহুমুখী গুণের অধিকারী হতে হবে তা না হলে তার বিয়েতে সমস্যা, মর্যাদায় সমস্যা। সুন্দর নারী মানে লাজুক, নম্র, ফর্সা, লম্বা চুলের অধিকারী ইত্যাদি। এ ধারণা থেকে বেরিয়ে আসা না গেলে নারীর প্রতি সহিংসতা এড়ানো যাবে না। কারণ সহিংসতার ভিত্তি দেয় এ ধারণাগত দিকগুলোই। পারিবারিক শিক্ষা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও জ্ঞানের মধ্য দিয়ে এর বিকাশ ঘটানো হয়। কিন্তু এ সমাজে নারী শরীরের যে গুণ, সৌন্দর্য, যে সামাজিক প্রয়োজনীয়তা তাকে খাটো করে দেখা হয়। নারীকে মাটি, খড় দিয়ে বানিয়ে মহৎ করে পুজো করা হয় কিন্তু ঘরের নারীর, মায়ের পরিচয়কে বড় করে দেখা হয় না।

তার ভূমিকা সবসময় অন্তরালে রয়ে যায়। এমনকি যে সন্তান এ মায়ের শরীর নিংড়ে বেড়িয়ে আসে, বড় হয় সে সন্তানও এ উপলব্ধিটুকু করতে পারে না। এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন।

এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ নারী ও শিশু পরিবারের সদস্য এবং কাছের পুরুষ আত্মীয়-স্বজন দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। কারণ তারা সামাজিকায়নের মধ্য দিয়ে আধিপত্যবাদী পুরুষ হিসাবে বেড়ে উঠে এবং তাদের যৌন ইচ্ছার প্রথম শিকার হয় হাতের কাছের নারীরা। কারণ অপরাধী জানে সামাজিক লোকলজ্জার জন্য এ ঘটনা অপ্রকাশিত থেকে যাবে। ছোটবেলা থেকেই রীতি, নীতি, প্রথা, অনুশাসন, বিধি, নিষেধ একজন শিশুকে শেখায় বড় হয়ে তাকে কেমন আচরণ করতে হবে, কি কি গুণ তার থাকতে হবে। একজন নারী ও পুরুষের প্রতি সামাজিক প্রত্যাশার ফলে নারীরা হয়ে উঠে ধৈর্য্যশীল, যত্নশীল, সহনশীল, ক্ষমাশীল, নমনীয় এবং সহযোগী। অন্যদিকে পুরুষরা হয়ে উঠে কঠোর, প্রতিবাদী, শক্তিশালী, বুদ্ধিদীপ্ত এবং নিয়ন্ত্রণকারী।

বরং একজন পুরুষ যদি নারীদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে তাহলে তাকে নপুংসক বলা হয় এবং সে বৈশিষ্ট্যগুলো ঝেটিয়ে বিদায় করে তবেই একজন সত্যিকারের পুরুষ হয়ে উঠতে হয়। ছেলেদেরকে প্রতিনিয়ত পরীক্ষার মাধ্যমে তারা যে পুরুষ হয়ে উঠছে সেটার প্রমাণ দিতে হয়। মানুষ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে নিজের করে নেয়। কারণ সমাজ তাকে সঙ্গ [illegible]। সমাজের সাথে সঙ্গতি বিধান করার জন্য বিভিন্ন নীতিমালা, মূল্যবোধ সে একা নিজের করে নেয়। ছেলে শিশু ও নারী শিশুর মধ্যে এ ভিন্ন সামাজিক প্রত্যাশার কারণে ছেলেরা অপেক্ষাকৃত সুবিধা, স্বাধীনতা নিয়ে বড় হয় কিন্তু, নারীদের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই। এখানে দুটি বিষয় স্পষ্ট যে, মেয়েদেরটা সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত আর পুরুষের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম-নীতি নেই। ক্রমান্বয়ে লালিত এ ক্ষমতা এবং সুযোগ এর সাথে পরবর্তীতে সহিংস পুরুষ হওয়া ও তার সহিংসতার সম্পর্ক রয়েছে। যারা আধিপত্যবাদী পৌরুষ মানসিকতা (পুরুষ ও নারী উভয়েই) ধারণ করেন তারা নারী এবং পুরুষদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং সহিংসতার জন্ম দেয়। তারা সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষমতা অর্জন করে। যেমন - উত্তরাধিকার ব্যবস্থা, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বিবাহ প্রথা, পরিবার প্রথা, রাজনৈতিক দল ও মতাদর্শ, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

আধিপত্যকারী চরিত্র হতে রক্ষা পেতে হলে আসলে পুরুষদেরকেও সহযোগী হিসেবে পেতে হবে। নারী মুক্তির প্রশ্নে তাদের ভূমিকাকে স্পষ্ট করতে হবে এবং সেই সাথে কম বয়সের বালক, যুবকদেরও মোটিভেশন করতে হবে যাতে তারা

পরবর্তীতে আধিপত্যকারী পুরুষের চরিত্র ধারণ করতে না পারে। কারণ প্রকৃত মুক্তি পেতে হলে নারী মুক্তির পাশাপাশি পুরুষ মুক্তির আলোচনাও করতে হবে। নারীরাই কেবল সহিংসতার শিকার হচ্ছে না, পুরুষরাও যৌন নিপীড়ন এর শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের মাদ্রাসার শিশুদের খবর নিলে এর সত্যতা মিলবে। চারদিকে সহিংসতার এত নগ্নরূপ যে, প্রতিনিয়ত ভয়, সঙ্কোচ নিয়ে পথ চলতে হয়। এ মানুষের জীবন হতে পারে না।

নারী অধিকার রক্ষা, প্রতিষ্ঠার জন্য, সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য কত না আন্তর্জাতিক, জাতীয় আইন তৈরী হয়েছে। সিডও, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী- ২০০৩), জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ইত্যাদি। সিডও সনদ নারী অধিকার রক্ষার আন্তর্জাতিক দলিল। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হলেও সরকারের আন্তরিকতার অভাবে এবং এ নিয়ে ভোটের রাজনীতি খেলার কারণে দীর্ঘ ২০ বছরেও সিডও সম্পর্কে স্পষ্ট কোন অবস্থানে আসতে পারেনি বাংলাদেশ। সিডও সনদেও দু'টি ধারা থেকে বাংলাদেশ এখনো "সংরক্ষণ" বা "আপত্তি" প্রত্যাহার করেনি। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ মূলনামূলক বিচারে অনেক বেড়েছে কিন্তু সমাজের মূলধারায় নারীর অবস্থান এখনো সুদৃঢ় হয়নি। নারীর প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন বেড়ে চলছে কিন্তু কোন প্রতিকার নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামে এ সহিংসতার ধরণ আরো প্রাতিষ্ঠানিক, আরো কাঠামোগত। পার্বত্য চট্টগ্রামে যারা নিরাপত্তার স্বার্থে আছি বলেন তাদের হাতেই প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, সাধারণ জুমিয়া কৃষকের জুম ভূমি দখল হয়, ভিটা মাটি, পরিবেশ ধ্বংস হয়। নারী তাদের কাছেই আরো অনিরাপদ, আরো অসহায়। বড়ইছড়িতে এক সেনা সদস্য কর্তৃক কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা এর বড় প্রমাণ। অথচ এর কোন বিচার হয়নি বরং মামলা আপোষে মীমাংসার জন্য চাপ বাড়ছে। যারা এর প্রতিবাদ করেছিল তাদের নামে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজতে হবে।

নারীর জীবনে এ সমস্যাগুলো ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট ও বর্তমান স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত। আদিবাসী নারীর সমস্যা একটি বহুমাত্রিক সমস্যা। একদিকে নারী হিসাবে পিতৃতান্ত্রিক বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার, আরেকদিকে আদিবাসী পরিবারের সদস্য হিসাবে জাতিগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। আদিবাসী ব্যক্তি মানুষ হিসাবে তার যে সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার তাও আজ গভীর সংকটে। নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা চর্চা ও বিকাশ ঘটানোর সুযোগ হচ্ছে সংকুচিত।

আদিবাসী নারী হিসাবে নিজ সমাজে সে একাধারে সামন্তীয় প্রথার বেড়াজালে, অন্যধারে পুঁজিবাদের ক্রম বিকাশের ফলে আদিবাসীদের মূল সম্পদ ভূমির উপর থেকে মালিকানা হারাচ্ছে। আদিবাসীরা কখনো ভূমির ব্যক্তি মালিকানা দাবী করেনি এই বোধে যে "ভূমি আমাদের সম্পত্তি নয়, আমরাই এ ভূমির সন্তান"। "ধরিত্রীমাতা" এ প্রকৃতি-পরিবেশকে তারা লালন-পালন, রক্ষা, পরিচর্যা, ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এবং বংশ পরম্পরায় একে ব্যবহার উপযোগী ও সমৃদ্ধ রাখে। এক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উপনিবেশিক শক্তির দ্বারা ব্যক্তি মালিকানা ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সাধারণভাবে আদিবাসীরা ভূমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। অন্যধারে, নারীরা আজ সম্পত্তির যৌথ মালিকানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং পুরুষেরা হচ্ছে আইনীভাবে বৈধ মালিক। সমাজে যখন ব্যক্তি মালিকানার প্রশ্ন এল, চাষবাস প্রথার প্রবর্তন এল, শ্রম বিভাজন এল তখন প্রতিষ্ঠিত হলো পুরুষের আধিপত্য। নারীকে অধস্তন রাখার সামাজিক অনুশাসন, বিধি তৈরী হলো। যে নারী লড়তে জানতো, অস্ত্র ধরতে জানতো তাকে মেনে নিতে হলো পরাধীনতা এবং এর ধারাবাহিকতা সুরক্ষিতভাবে এগিয়ে চলছে।

প্রতিটি মানুষেরই বহুমুখী পরিচিতি রয়েছে। তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীও আদিবাসী নারী, বাংলাদেশী, সংখ্যালঘু, মা, শাশুড়ি নানা পরিচয়ে সে পরিচিত এবং এই নানা পরিচয়েই সে বৈষম্যের শিকার হয়। যখনই কোন নারী বৈষম্যের শিকার হয় কেবল নারী হওয়ার জন্যই হয় না তার অন্যান্য পরিচয়ের জন্যেও হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি পরিচয়ের সাথে এক একটি বৈষম্য জড়িত। শ্রেণীগতভাবে গরীব হওয়ার কারণে, বয়সের কারণে, বিবাহিত বা অবিবাহিত হওয়ার কারণেও একজন নারী বৈষম্যের শিকার হয়। একজন নারীর বহুমাত্রিক পরিচয়ের কারণেই বহুমাত্রিক শোষণ। আবার একজন আদিবাসী পুরুষও বেকার হিসেবে, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষিত না হবার কারণে, গরীব হবার কারণে, পিছিয়ে পড়া হিসেবে বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। আবার পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন হচ্ছে "ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত", কারণ এর ফলে পরোক্ষভাবে একজন নারীই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সে সামাজিকভাবে অসহায় হয়ে পড়ছে, প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এটি যারা করছেন তারা বুঝে, শুনেই করছেন। এর অবসান হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে নারী মুক্তির বিষয়টি অনেক ব্যাপক। এর জন্য বিভিন্ন মত রয়েছে ও পথের ভিন্নতাও রয়েছে। অনেক নারী কর্মী নারীদের দৈনন্দিন জীবনের সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে নারীকে সুরক্ষা দেয়ার কাজকেই গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়া রয়েছে

আইনী সহায়তা, চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের কাজ। সেটার অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে। কারণ অপরাধের দায়মুক্তির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এসে উদাহরণ তৈরী করা প্রয়োজন যে, অন্যায়ের প্রতিকার আছে, আইন কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের দেশে নারী আন্দোলন মানে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। পার্বত্য চট্টগ্রামের নারী আন্দোলনও এর ব্যতিক্রম নয়। নারী আন্দোলন বলতে আমরা বুঝি নারীরা ঘরের বাইরে যাবে, চাকুরী করবে অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে জড়িত হবে, আইনগতভাবে অধিকার পাবে; যেমন- সম্পত্তি। বর্তমানে নারী স্বাধীনতার কথা উঠলেই কিছু মানুষ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতার নাম তুলে বলে নারীরা অনেক স্বাধীনতা ভোগ করছে। সেটা না করে নিজের ঘরের নারীর চেহারা দেখা প্রয়োজন। সেওতো সমাজের একটি অংশ। বাংলাদেশের পুরো চেহারা যদি দেখতে হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রীকে দেখলে কি সেটা পাওয়া যাবে? এরকম দু'একজন নারী সবসময়ই থাকে যাঁরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন। নারী মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে দু'ধরনের মত রয়েছে। যেমন- এক পক্ষ মনে করেন নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীদের আইনী অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সে কারণে অনেকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন নারীর আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজকে। অন্যদিকে, আরো একটি মত হলো- প্রচলিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার রূপান্তর ছাড়া নারী মুক্তি সম্ভব নয়। সে কারণে তারা যেসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নারীর বঞ্চনা ও বৈষম্য টিকিয়ে রাখে সেসব ব্যবস্থা পরিবর্তনের উপর জোর দিচ্ছেন। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, চিন্তা, আচরণ থেকে মুক্ত হবার জন্য কৌশল নির্ধারণ করছেন। সমাজে যে সমস্ত নির্যাতনের ঘটনাগুলো ঘটে তার বিপরীতে বা তা থেকে মুক্তির জন্য মেয়েরা যে কৌশল বর্তমানে নিচ্ছে তা হল আত্মহত্যা। এটি একটি সহিংস কৌশল সর্বোপরি এটি পিতৃতান্ত্রিক কৌশল। এ কৌশল থেকে মুক্তি প্রয়োজন।

আজকের এ ৭ম সম্মেলন থেকে উইমেন্স রিসোর্স নেটওয়ার্ক প্রত্যাশা করে - সমাজে নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্য থেকে মুক্তিতে বিশ্বাসী সমমনা সংগঠনগুলোর সাথে ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হবে এবং জাতি, ধর্ম, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমতাভিত্তিক সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে আসবে। এ সম্মেলনের আহবান-

১. নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুন।

২. জাতীয় সংসদে পার্বত্য নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

৩. নারী নীতিতে আদিবাসী নারীদের ন্যায্য অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৪. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীদের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
৫. নারী-পুরুষের সমমজুরি নিশ্চিত করতে হবে।
৬. প্রথাগত শাসন ব্যবস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
৭. পার্বত্য নারী ও শিশুর নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে হবে।
৮. পার্বত্য নারীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৯. পার্বত্য নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।
১০. উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

****

প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা ও নারীর ন্যায় বিচার

(১৪ মে ২০১৫ইং রাঙ্গামাটির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক-এর নবম পার্বত্য নারী সম্মেলনে উপস্থাপিত ধারণাপত্র।)

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিন পার্বত্য জেলায় যুগ যুগ ধরে চাক, খুমী, খিয়াং, লুসাই, পাংখোয়া, বম, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, মারমা, চাকমা- এই ১১টি জাতিসত্ত্বার বসবাস। এছাড়াও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী ও কিছু সংখ্যক অহমিয়া, গুর্খা ও সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত এই আদিবাসী জাতিসমূহের প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি, প্রথা, রীতিনীতি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তথা নিজস্ব জীবন প্রণালী, যা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তবে পার্বত্য অঞ্চলের এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থাও মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক এবং নিজস্ব প্রথা ও রীতি নীতি নির্ভর। অন্যান্য পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার মত আদিবাসী সমাজেও নারীরা পুরুষের তুলনায় নীচু মর্যাদা ও বৈষম্যের শিকার। আমরা জানি বৈষম্য ও নির্যাতন পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলে। আদিবাসী সমাজে এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক, ফতোয়া, ধর্ষণের মত নির্যাতন প্রকট না হলেও পুরুষের বহুবিবাহ, মদ্য পান ও বউ পেটানোর মত নির্যাতন বিদ্যমান।

আদিবাসী সমাজে নারীরা হলো পরিবারের চালিকাশক্তি। তারা পুরুষের পাশপাশি জুমে, জমিতে সমানতালে শ্রম দিয়ে আসছে। রান্নাবান্না থেকে সন্তান লালন পালন, গবাদি পশু পালন থেকে জ্বালানী কাঠ, তরিতরকারী সংগ্রহসহ সমস্ত গৃহস্থালী কাজের ভার গ্রামীণ নারীর কাঁধে ন্যস্ত। শহুরে বা কর্মজীবী নারীর ক্ষত্রেও উপার্জনের পাশাপাশি গৃহস্থালী কাজের প্রাথমিক দায়িত্বও তাকে পালন করতে হয়। সমস্ত কাজের চাপ সামলে পাহাড়ী নারীরা নিজের ও পরিবারের ব্যবহারের জন্য নিজস্ব কোমর তাঁতে কাপড় বোনে। কেউ কেউ পরিবারের পুরুষের জন্য চোলাই মদ তৈরী করে। এসবের পর আদিবাসী নারীর বিশ্রাম বা বিনোদন বলে কিছুই থাকে না। কিন্তু পরিবার ও সমাজে আদিবাসী নারীর এই অবদান খুব কমই মূল্যায়িত হয়।

আদিবাসী নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে প্রায় বঞ্চিত। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত। নারীর পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিস্বত্তাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কখনোই স্বীকার করে না। নারীরা তাই কখনো পিতা, কখনো স্বামী, কখনো বা পুত্রের অধীনে থাকে। শিক্ষা, উপার্জন, ক্ষমতা ইত্যাদিতে পিছিয়ে থাকা ও পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকার কারণে পাহাড়ী নারীরা পারিবারিক নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার। অন্যদিকে নিজ সমাজের বাইরে জাতিগত নিপীড়ন, সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে পাহাড়ী নারীরা সহজেই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। যার ফলে প্রতিনিয়ত পাহাড়ী নারী ও মেয়ে শিশুদের প্রতি ধর্ষণ, হত্যা ও যৌন নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে চলেছে। সাম্প্রতিক কিছু সমীক্ষায় প্রথাগত আইন ও বিচার ব্যবস্থায় আদিবাসী নারীর প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্যের চিত্র উঠে এসেছে। তাই আদিবাসীদের জাতিগত সঙ্কট নিরসনের পাশাপাশি অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য নিরসন অত্যন্ত জরুরী।

এই প্রেক্ষাপটে এবারের নবম পার্বত্য নারী সম্মেলনে প্রথাগত শাসন ব্যবস্থায় আদিবাসী নারীর ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথাগত আইন ও বিচার ব্যবস্থা:

পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও অনন্য ভূ-প্রাকৃতিক গঠন, পৃথক নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, পৃথক রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা বরাবর এদেশের অপরাপর অঞ্চল হতে ব্যতিক্রম হিসাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। যেমন- বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত তিন পার্বত্য জেলায় কোন পারিবারিক আদালত নেই। কারণ এ অঞ্চলে আদিবাসীরা কোন ধর্ম ভিত্তিক ব্যক্তিগত আইন দ্বারা পরিচালিত নয়। বাঙালী ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা যেমন- মুসলিম আইন, বাঙালী সনাতন ধর্মাবলম্বীরা হিন্দু আইন ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা খ্রিষ্টান ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা বৌদ্ধ, সনাতন ও খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী হলেও নিজস্ব প্রথাগত আইন অনুসরণ করে আসছে।

১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনের ১৮ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪০ নং বিধি, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৬ ধারা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ২২ (ঙ) ধারায় সার্কেল চীফ, মৌজা হেডম্যান ও কার্বারীগণকে আদিবাসীদের প্রথা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে

নিজেদের মধ্যে উদ্ভূত সামাজিক বিরোধ নিষ্পত্তির বিচারিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গ্রাম কার্বারী, মৌজা হেডম্যান ও সার্কেল চীফ এই তিন স্তরের ঐতিহ্যবাহী প্রথাগত আদালতে আদিবাসীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। সাধারণত বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভরণপোষণ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার, নারী সংক্রান্ত (ছিনালী মোকদ্দমা), সামাজিক শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিরোধ ইত্যাদি প্রথাগত আদালতে বিচার নিষ্পত্তি হয়ে থাকে।

তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৪০ নং বিধিতে সার্কেল চীফ ও হেডম্যানের বিচার ক্ষমতা বহির্ভূত কিছু অপরাধের তালিকা (যেমন- খুন, ধর্ষণ, অপহরণ, ডাকাতি ইত্যাদি) নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিধি অনুযায়ী হেডম্যানের বিচারের বিরুদ্ধে সার্কেল চীফের কাছে এবং সার্কেল চীফের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ডেপুটি কমিশনারের নিকট রিভিশনের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। হেডম্যান ২৫ টাকা এবং সার্কেল চীফ ৫০ টাকা পর্যন্ত বিধি অনুযায়ী জরিমানা করতে পারেন। তবে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৬ ধারায় কার্বারী রায়ের বিরুদ্ধে হেডম্যান, হেডম্যানের রায়ের বিরুদ্ধে সার্কেল চীফ ও সার্কেল চীফের রায়ের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিলের বিধান রাখা হয়েছে। কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তবে আপিল নিষ্পত্তির পূর্বে বিভাগীয় কমিশনার সংশ্লিষ্ট উপজাতি জনগণ থেকে তিন (৩) জন মনোনীত ব্যক্তির সাথে পরামর্শের বিধান রয়েছে। এছাড়া বিচার পদ্ধতি, বিচার প্রার্থী ও আপীলকারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদগুলোর রয়েছে।

সার্কেল	সার্কেল চীফ			হেডম্যান			কার্বারী		
	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	ইারী	পুরুষ	মোট
চাকমা		১	১	৫	১৭৩	১৭৮	৯৩	১১৯৭	১২৯০
এং		১	১	৪	৮৪	৮৮	২	৬৮৫	৬৮৭
বোমাং		১	১	৩	১০৬	১০৯	১	৮৯২	৮৯৩
মোট		৩	৩	১২	৩৬৩	৩৭৫	১০৩	২৭৭৪	২৮৭০

প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে নারীঃ

রাজা-হেডম্যান-কার্বারী নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ আদিবাসী পাহাড়ীদের প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে পাহাড়ি নারীদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত অল্প ও সীমিত। রাজা বা সার্কেল চীফ পদটি বংশপরম্পরার একটি উত্তরাধিকারী পদ। অপরদিকে, তিন সার্কেলে মোট ৩৬৯ জন হেডম্যান রয়েছেন। হেডম্যান নিয়োগ বংশানুক্রমিক নয়, তবে নিযুক্তির ক্ষেত্রে হেডম্যানের পুত্র অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। ফলে এ পদেও আদিবাসী পাহাড়ী নারীরা অবহেলিত ও উপেক্ষিত। ৩৬৯ জন হেডম্যানের

মধ্যে নারী হেডম্যান হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র। অনুরূপভাবে গ্রাম প্রধান কার্বারী পদেও পাহাড়ি নারীর অংশীদারিত্ব একেবারেই হতাশাব্যঞ্জক বলা যায়। তবে গত প্রায় বছর খানেকের মধ্যে চাকমা সার্কেলে প্রায় ৯৩ জন নতুন নারী কার্বারী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন, যা নারীর ক্ষমতায়ন ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

প্রথাগত আইন ও আদিবাসী নারী:

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের প্রথাগত আইন সম্পূর্ণ অলিখিত যা মৌখিকভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। সমাজ বিবর্তনের ধারায় অনেক প্রাচীন প্রথা বর্তমানে পরিবর্তিত হয়েছে। তথাপি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক অনেক প্রথা ও রীতি-নীতি পাহাড়ী আদিবাসী সমাজে এখনো রয়ে গেছে।

আদিবাসী সমাজে বিবাহ নিবন্ধনের কোন রীতি নেই এবং বিয়ের কোন লিখিত দলিল তৈরী করা হয় না। ইদানীংকালে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা বিয়ের নামে অসৎ পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। প্রেমের কারণে অভিভাবকের অমতে বা অন্য কোন কারণে সীমিত পরিসরে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে পরবর্তীতে সেই পুরুষ যদি সেই স্ত্রীর সাথে বিয়ে অস্বীকার করে তাহলে স্ত্রীর পক্ষে তা প্রমাণ করা কঠিন। এভাবে কিছু অসাধু পুরুষ তার বিয়ে গোপন করে বা অস্বীকার করে অন্য নারীর সাথে সম্পর্কে জড়াচ্ছে বা স্ত্রীকে ত্যাগ করে ভরণ পোষণের খরচ দেয়া থেকে বিরত রয়েছে।

আদিবাসী সমাজ পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা অনুমোদন করে। একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, তবে একজন পুরুষ ঠিক কতজন স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে এরূপ কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রথাগত আইনে উল্লেখ নেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের উপর নারীর নির্ভরশীলতার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী প্রায়শই ন্যায় বিচার ও ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। একজন পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করা যতটা সহজ একজন নারীর পক্ষে বিবাহ বিচ্ছেদ করা তত সহজ নয়। কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চাইলে শুধুমাত্র স্বামীর নির্দেশ মেনে না চলা বা স্বামীর অবাধ্য এই অজুহাতে স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ দিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী ও সন্তানকে ভরণ পোষণ দেওয়া থেকে বিরত থাকা এবং দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্য স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয় যাতে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ চাইতে বাধ্য হয়।

প্রথাগত বিচার ব্যবস্থায় সামাজিক বিচারের ভার যাদের উপর ন্যস্ত অর্থাৎ কার্বারী, হেডম্যান, সার্কেল চীফ পুরুষ বিধায় অনেকেই নারীর প্রতি সংবেদনশীল নয়। অনেক নারী পুরুষ বিচারকের সামনে বা আত্মীয় পুরুষের সামনে নিজের সমস্যার কথা খুলে বলতে সংকোচ বোধ করেন। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী বা শ্বশুর বাড়ী এলাকায় বিচার সালিশ বসে, যেখানে স্বামীর আত্মীয় স্বজনের আধিক্য থাকায় স্ত্রী ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। নারী স্বাবলম্বী নয় ও আশ্রয়হীন বলে কখনো চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। ম্রো ও খুমী সম্প্রদায়ের নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদ হলে প্রথা অনুযায়ী সন্তানের অধিকার ও অভিভাবকত্ব হারায়।

কার্বারী, হেডম্যান, সার্কেল চীফের রায় বা সিদ্ধান্ত কোন পক্ষ না মানলে রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এ ক্ষেত্রেও নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন: কোন ভরণ পোষণের মামলায় স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি মাসিক বা এককালীন খরপোষের আদেশ দিলে স্বামী যদি তা না মেনে এলাকা ছেড়ে চলে যায় তাহলে তা কার্যকর করা সম্ভব হয় না। তবে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৪০ নং বিধিমতে সার্কেল চীফ বা হেডম্যানের কোন মামলার রায়ের আরোপিত শাস্তি কার্যকর করার জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করার বিধান আছে। কিন্তু এই বিধির চর্চা খুব কমই লক্ষ্য করা যায়।

সম্পত্তির অধিকার বা উত্তরাধিকার ক্ষমতায়নের প্রধান ভিত্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, খিয়াং, ত্রিপুরা এবং চাকমা ও মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত মারমাদের উত্তরাধিকারী রীতি অনুযায়ী কোন ব্যক্তির পুত্র সন্তান বা পুত্র সন্তানগণই সর্বাগ্রে অপ্রতিরোধ্য আইনগত উত্তরাধিকারী। পুত্র সন্তান পিতার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। কেবলমাত্র কোন ব্যক্তির পুত্র সন্তান না থাকলে কন্যা সন্তান বা কন্যা সন্তানগণ প্রত্যেকে পিতার সম্পত্তিতে সমান অংশের অধিকারী হয়।

উপরোল্লিখিত নারীর এই বৈষম্যপূর্ণ অবস্থানই তার প্রতি নির্যাতন বয়ে নিয়ে আসে। শুধু শারিরীক নির্যাতনই নির্যাতন হিসেবে গণ্য হয় না। 'মানসিক নির্যাতন'ও নির্যাতনের আওতায় পড়ে। আমরা জানি, নারীর অংশগ্রহণ বর্তমানে সমাজ উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক কিন্তু সহিংসতা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়। সহিংসতার ফলে নারীর ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ও সৃজনশীলতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এজন্য দরকার সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তন এবং নারীকে ব্যক্তি ও নাগরিক হিসেবে দেখার জন্য আমাদের মনোগঠনের পরিবর্তন। পরিবারে ও সমাজে নারীকে ব্যক্তি হিসেবে

বিকশিত হতে সহায়তা করা।

এ প্রেক্ষাপটে আদিবাসী নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধ করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশমালা তুলে ধরছি-

সার্কেল চীফ ও হেডম্যানগণের প্রতি

- আদিবাসী নারীর সমঅধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রথাগত আইন বিশ্লেষণ করে যুগোপযোগী করা।
- সম্পত্তিতে আদিবাসী নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা।
- প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতার ভিত্তিতে নারীকে নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রথাগত সামাজিক আদালতের রায়ের রেকর্ড সংরক্ষণ করা।
- আদিবাসী সমাজে বিবাহ নিবন্ধন ও সনদের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- প্রথাগত বিচার কার্যক্রমে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
- প্রথাগত বিচার ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও জনপ্রিয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- পুরুষের বহুবিবাহ প্রথাগত আইনে নিষিদ্ধ করা।

সরকারের প্রতি

- পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ৬৬ (৪) ধারার অধীনে উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত প্রবিধান প্রণয়ন করা।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিশেষ শাসন কাঠামোর অধীনে বিদ্যমান স্থানীয় সংস্থাসমূহকে আইন অনুযায়ী যথাযথভাবে শক্তিশালীকরণ।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচারকগণকে নিযুক্তি/বদলীর আগে আদিবাসীদের প্রথাগত আইনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রযোজ্য অন্যান্য আইন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

নারী অধিকার ও মানবাধিকার সংগঠনের প্রতি

- নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও অমর্যাদাকর প্রথা ও রীতিনীতিগুলো বর্জন করার

জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

- আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও সংগঠনের মধ্যে লিঙ্গ-সংবেদনশীল কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- সম্পত্তির উপর আদিবাসী নারীর উত্তরাধিকার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- আদিবাসী নারীদের উপর সহিংসতা বন্ধের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জেন্ডার ন্যায্যতা নিশ্চিত করুন

(২৮ মে ২০১৬ ইং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের ১০ম পার্বত্য নারী সম্মেলনে উপস্থাপিত ধারণাপত্র। ধারণাপত্রটি উপস্থাপন করেন এডভোকেট সুস্মিতা চাকমা।)

নারী ও পুরুষ মিলে মানব সমাজ। মানব সভ্যতার বিকাশের সূচনা লগ্নে সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা থাকলেও কালের আবর্তে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামো বিস্তার লাভ করে যা নারীকে পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখে পুরুষের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীর অধিকার হরণ ও নারীকে অবদমিত করে নারীকে ক্ষমতাহীন করা হয়েছে। আজ সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি স্বত্তেও সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে অবস্থান, মর্যাদা ও ক্ষমতার দিক থেকে বৈষম্য রয়েছে। নারী ও পুরুষের এ বৈষম্যপূর্ণ অবস্থাই সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার অন্যতম প্রধান কারণ। বিগত কয়েক দশক ধরে সারা বিশ্বে এ বৈষম্য নিরসন করে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানাবিদ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ফলে এ অবস্থার কিছুটা অগ্রগতি হলেও সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য এখনো ব্যাপকভাবে রয়ে গেছে। নারী আজও নানান রূপে, নানান মাত্রায় সহিংসতার শিকার হচ্ছে।

জেন্ডার ন্যায্যতা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ও পদক্ষেপ: বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমতা, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ও নারীর প্রতি সকল ধরণের বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডো) স্বাক্ষর করেছে। সরকার সিডো সনদে স্বীকৃত অধিকারের আলোকে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, নারীর সুরক্ষা ও নারীর উন্নয়নে বেশ কিছু নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারীর সুরক্ষায় চলমান আইনের পাশাপাশি যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, এসিড দমন আইন ২০১০, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন ২০১৩ ইত্যাদি বিশেষ আইনও প্রণয়ন করেছে। নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালাও তৈরী করেছে। নারী শিক্ষা প্রসারে ছাত্রীদের বৃত্তি ও অবৈতনিক শিক্ষা চালু এবং

স্বাস্থ্য সেবায় গর্ভকালীন স্কীম, মাতৃত্বকালীন ভাতা ও ছুটি এবং গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভায় ৩ জন সংরক্ষিত নারী সদস্য ও উপজেলা পরিষদে ১ জন নারী ভাইস চেয়ারম্যানের পাশাপাশি জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন পঞ্চাশে উন্নীত করা হয়েছে। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে ৩ জন করে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ৩ জন নারী সদস্যপদ সংরক্ষিত আছে। এছাড়াও ২০০০ সালের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) ও এর পরবর্তী ২০১৬ সালের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

অন্যদিকে সিডো সনদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা ২ ও ১৬(১)(গ) সরকার এখনো সংরক্ষিত রেখেছে। নারী উন্নয়ন নীতিমালা পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল প্রণয়ন করা হয়নি। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। সরকারী-বেসরকারী নানা ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে নারী শিক্ষা, মাতৃস্বাস্থ্য, নারী ক্ষমতায়ন প্রভৃতিতে বেশ কিছু উন্নতি হলেও এখনো পর্যন্ত নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, অভিগম্যতা, ন্যায্যতা, উত্তরাধিকার ও সম্পদের মালিকানা সহ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও দলীয় স্বার্থ ও পুরুষতান্ত্রিকতার বেড়াজাল ডিঙিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। নির্বাচিত নারী সদস্যরাও কাঠামোগত বৈষম্যের শিকার হয়ে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন। এই বৈষম্যই অনেকাংশে নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনকে জিইয়ে রাখছে। নারীরা প্রায়শঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও বৈষম্যের শিকার। নারীরা ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে শারীরিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর কারণেই অনেকাংশে নারীরা ন্যায় বিচার থেকেও বঞ্চিত হয়ে থাকে। নারী উন্নয়নে ও নারীর নিরাপত্তায় নানাবিধ পদক্ষেপ থাকা স্বত্তেও জেন্ডার ন্যায্যতার প্রশ্নটি রয়ে গেছে।

পার্বত্য নারীর অবস্থা: সারা দেশের মত পার্বত্য অঞ্চলেও নারীরা বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এখানে নারীর পরিচয় বহুমুখী। এ বহুমুখী পরিচয়ের মাধ্যমে তারা বহুমুখী বৈষম্যের শিকার হন। দুর্গম, সুবিধা বঞ্চিত, প্রান্তিক অঞ্চলের নারী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে অধিক বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার (বিশেষত আদিবাসী নারী) হচ্ছেন। বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন ১৫ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোতে ১ জন উপজাতি

ও ১ জন অ-উপজাতিসহ তিন পার্বত্য জেলায় মোট ৬ জন মাত্র নারী সদস্য আছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান - সার্কেল চীফ, হেডম্যান, কার্বারী - যাদের উপর পার্বত্য আদিবাসীদের সামাজিক বিচার, মৌজা সার্কেলের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ খাজনা আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত। এ প্রতিষ্ঠানগুলোও পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতা কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত। তিন সার্কেল প্রধান, ৩৭৫টি মৌজা প্রধান বা হেডম্যান পদে ৩৬৬ জন, প্রায় ২৮৭০ জন কার্বারীর পদে ২৭৭৪ জন পুরুষ। তবে বিগত কয়েক বছরে চাকমা সার্কেলে ১২০ জনের অধিক নারী কার্বারী পদে নিয়োগ পেয়েছেন যা নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীদের মজুরী বৈষম্য, বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্রথা, স্বামীর বহু বিবাহসহ নানাবিদ পারিবারিক নির্যাতন রয়েছে। আদিবাসী নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকেও প্রায় বঞ্চিত। ভিন্ন চেহারা, ভিন্ন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের কারণে আদিবাসী নারীরা প্রতিনিয়ত ধর্ষণ, খুন, অপহরণ ও যৌন পীড়নের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া ভূমি বেদখল, বৃহৎ সংস্কৃতির আগ্রাসন ও জাতিগত নিপীড়নের অংশ হিসেবেও আদিবাসী নারীরা সহজে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছেন। উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিরোধের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কিন্তু সহিংসতার মাত্রা যেন পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক, কাপেং ফাউন্ডেশন, মালেইয়া ফাউন্ডেশন, হিল উইমেন ফেডারেশন, কেএমকেএস, পুগোবেল সহ বিভিন্ন সংস্থার নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্যসূত্রে তারই প্রমাণ মেলে। এখন সহিংসতার ধরণও পাল্টাচ্ছে। ৯-১৬ বছর বয়সের কন্যা শিশুরা অধিক হারে ধর্ষণ, খুনসহ যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১১ - জুলাই ২০১৫ পর্যন্ত মোট ২২০ জন নারী ও শিশু ভিকটিম সেবা গ্রহণ করেছেন। তার মধ্যে ধর্ষণের শিকার সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৪৪ জন ও পারিবারিক সহিংসতার শিকার সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৭১ জন।

পারিবারিক সহিংসতা: আমাদের দেশে নারীর প্রতি সহিংসতার অন্যতম ক্ষেত্র হলো পারিবারিক নির্যাতন। যা ছাই চাপা আগুনের মত নারীকে গুমড়ে গুমড়ে মারছে। কিছুদিন আগেও আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক সহিংসতাকে

ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয় বলে অবহেলা করা হতো। কিন্তু পারিবারিক নির্যাতন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে ২০১১ সালে পারিবারিক সহিংসতা আইন প্রণয়ন করা হয়। প্রথম বারের মত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সার্ভে ২০১১ নামে একটি জরিপ চালায় যা জানুয়ারী ২০১৪ সালে দৈনিক প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই জরিপ মতে বাংলাদেশে ৮৭% নারী কোন না কোনভাবে স্বামীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়। তার মধ্যে ৮১.৬% মানসিক, ৫৩.২% অর্থনৈতিক, ৩৬.৫% যৌন এবং ৬৪.৬% শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীদের পারিবারিক সহিংসতা নিয়ে কোন প্রাতিষ্ঠানিক জরিপ না হলেও নির্যাতনের মাত্রা মোটেও কম নয়। কোন কোন আদিবাসী পরিবারে মদ খেয়ে বউ পেটানো যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। উত্তরাধিকার, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, ভরণ-পোষণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীরা বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হয়।

আদিবাসী সমাজের প্রথাগত আইন ও বিচার ব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক এবং নারীর প্রতি অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক। এই বিচার ব্যবস্থায় জেন্ডার ন্যায্যতা আনা অত্যন্ত জরুরী। প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সমাজের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আরও অনেক প্রভাবশালী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে জেন্ডার ন্যায্যতা নিশ্চিত করা দরকার। অনেক প্রতিষ্ঠানে নারী পুরুষের সংখ্যাগত সমতা ও জেন্ডার নীতিমালা কোনটিই নেই। সীমিত আকারে কিছু প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতা কাঠামোতে নারী-পুরুষের সংখ্যাগত সমতা প্রতিষ্ঠা করতে দেখা যাচ্ছে। জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়নও করা হচ্ছে। কিন্তু সত্যিকারের সমতা এখনো অনেক দূরে। জেন্ডার নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নও খুব একটা দেখা যাচ্ছে না।

আধিপত্যবাদী পৌরুষবোধ ত্যাগ করে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী নয় এমন ব্যক্তি এখনো সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া, আরও কিছু ব্যক্তি নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছেন যারা জনসমক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন, সম অধিকার ও নারীর প্রতি সম্মানের কথা বললেও বাস্তব জীবনে এর চর্চা দেখা যায় না। নারীর প্রতি সহিংসতা, বিশেষতঃ পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধিতে এ ধরণের নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তিরাই অন্যতম প্রধান সহায়ক। সময় এসেছে সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব প্রদানকারী এ সকল ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং এদের নারীর প্রতি অন্যায় আচরণসমূহ জনসমক্ষে তুলে ধরা। নারীর প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিবারের পাশাপাশি সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানে

জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা জরুরী হয়ে পড়েছে। এজন্য সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী ও বাস্তব জীবনে নারীকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদানকারী ব্যক্তিদের নেতৃত্বে নিয়ে আসার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

১০ম পার্বত্য নারী সম্মেলনে উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুপারিশ হিসেবে তুলে ধরছেঃ

১. পার্বত্য অঞ্চলের সকল সরকারী ও বেসরকারী রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা এবং নেতৃত্বের মধ্যে জেন্ডার সংবেদনশীল ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া। নারীর সম মজুরী ও কর্মক্ষেত্রে জেন্ডারবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

২. পার্বত্য অঞ্চলে প্রথাগত প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতিনিধিত্ব ও বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। আদিবাসী নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিশ্চিত করা। পুরুষের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা ও এ লক্ষ্যে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

৩. পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতি দ্রুত পার্বত্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

৪. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও কর্মপরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়ন [illegible]। রাজনৈতিক দলগুলোতে নারী প্রার্থী মনোনয়ন বৃদ্ধি করা। নারীর [illegible] সহিংসতা প্রতিরোধে বিদ্যমান সকল আইন যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

৫. সিডো সনদের সংরক্ষিত ধারা ২ ও ধারা ১৬ (১)(গ) উন্মুক্তকরণসহ সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সকল নারী সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন করা।

উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের পটভূমি

২৩ নভেম্বর ২০০১ সালে কিছু নারী উন্নয়ন কর্মী পার্বত্য অঞ্চলের নারীদের অবস্থা আলোচনার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। এখানে তারা উপেক্ষিত, সুবিধা বঞ্চিত, শোষিত ও নির্যাতিত নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য উইমেন্স টাস্কফোর্স গঠন করে। এ টাস্কফোর্সর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সভা, অনুষ্ঠান ও কর্মশালায় আয়োজন, বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও যৌথ উদ্যোগে কিছু সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

০১ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে রাঙামাটিতে বিভিন্ন শুভাকাঙ্খী সংগঠনের উপস্থিতিতে উইমেন্স টাস্কফোর্সের সদস্যদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় উইমেন্স টাস্কফোর্স-এর নাম পরিবর্তন করে "উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক" ইংরেজীতে Women Resource Network সংক্ষেপে WRN করা হয়।

পরবর্তীতে ২২-২৪ নভেম্বর ২০০৯ সালে তিন পার্বত্য জেলার উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্কের কর্মী ও শুভাকাঙ্খীদের নিয়ে এক রূপকল্প তৈরীর কর্মশালা করা হয়। যার ভিত্তিতে "উইমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক"-এর ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য ও কর্ম-কৌশল নির্ধারণ করা হয়।

নেটওয়ার্কের স্বপ্ন হলো পার্বত্য অঞ্চলে একটি সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর, স্বশাসিত ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে আদিবাসী নারীরা মর্যাদার সহিত বসবাস করতে পারবে ও যেখানে সকল নারী-পুরুষের সম্পর্ক হবে সমতার, ভালোবাসার, বন্ধুত্বপূর্ণ ও মর্যাদার।

WRN

উইমেন রিসোর্স
নেটওয়ার্ক